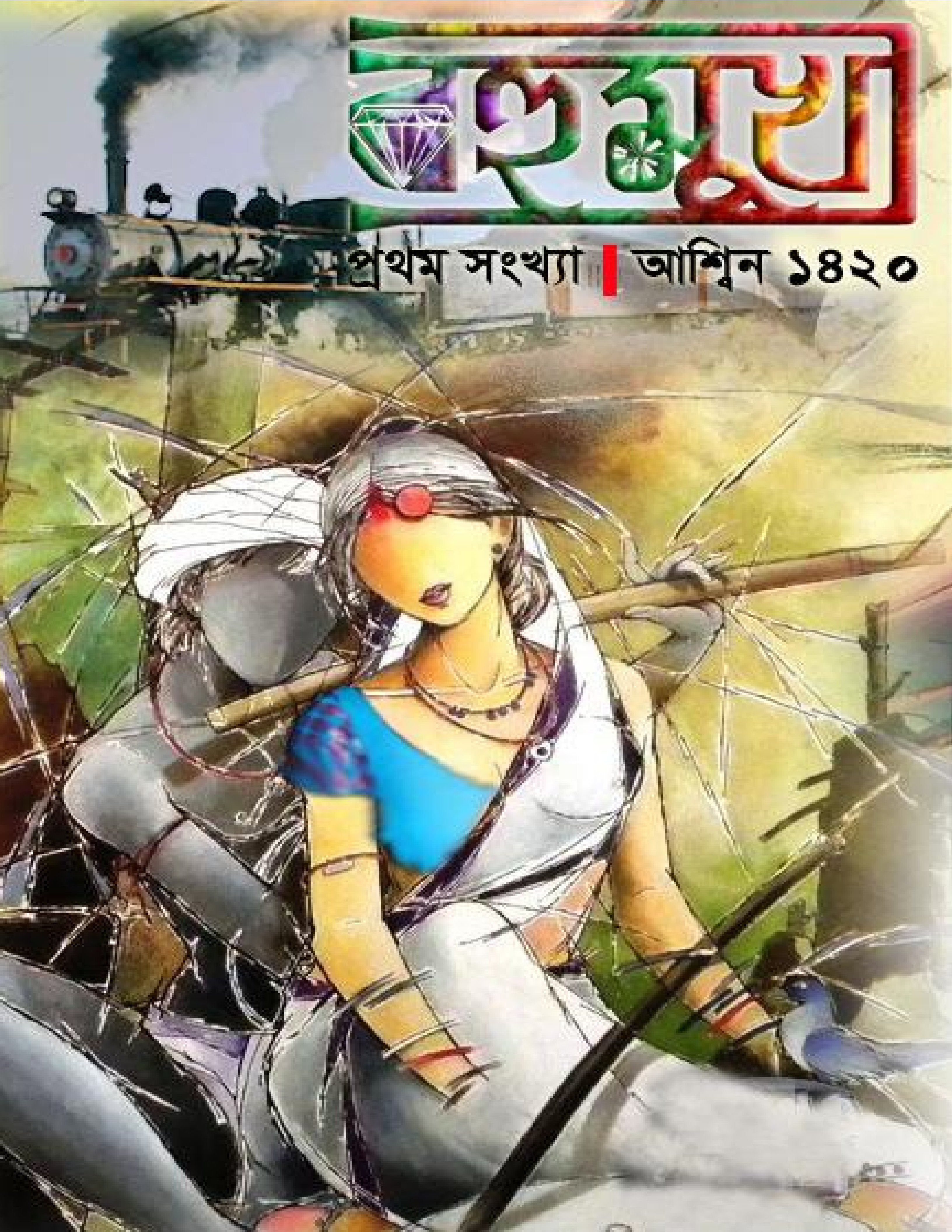
প্রথম সংখ্যা | আশ্বিন ১৪২০

সূচীপত্র

প্রথম সংখ্যা
আশ্বিন ১৪২০

সম্পাদকীয় ৩

উপন্যাস

উটকামন্ডে হত্যাকান্ড – সৈকত ভট্টাচার্য ৪৬

ছোটগল্প

স্মৃতিটুকু থাক – প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫

শ্রেয়ার শ্রেয় – আদি ১২

এক মুহূর্তের জন্য – অঙ্কু ১৬

গিটার – অঞ্জন দত্ত ২৩

কমিকস

ব্যাটম্যান – অনুবাদ ও বাংলা চিত্রণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ৬৭

প্রবন্ধ

সেই দিন এই দিন – গগন হরকরা ৩১

ফিচার

যদি - শঙ্কু ৩৪

কৌতুক নকশা – শঙ্কু ৩৭

বিতর্ক

বাংলা বই বৈদ্যুতিকরণে প্রকাশকদের কতটা ক্ষতি হচ্ছে ৪

রান্নাবান্না

বাসি খাবারের হরেক বাহার - স্বাগতা ঘোষ ৩৯

কবিতা

নতুন গল্প – সুমিত রঞ্জন দাস ৪২

যে সরল অংকের সমাধান হলো না - পান্থজন / ফালতু লোক ৪২

একটি পার্শ্বচরিত্র - নবীন দাস ৪৩

হৃদ-নীতি - আসাদুজ্জামান সুনাম ৪৪

দুটি কবিতা - অঙ্কিতা মাইতি ৪৪

প্রচ্ছদঃ রাজু বিশ্বাস, সূচীপত্রের অলংকরণঃ সুব্রত দাস

সম্পাদকীয়

ই-পত্রিকাকে দেওয়াল পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিনের নতুন প্রজন্মের সংস্করণ বলা চলে। একটি ছোট্ট বৃত্তের অন্তর্গত কিছু সাহিত্য মননের সমাহারে এদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হলেও এরাই হল সাহিত্য-সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর। সেখানেই জন্ম হল www.bengalidownload.com–এর বৈদ্যুতিন পত্রিকা বহুমুখীর। যে কোন পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়র জবাবদিহি হিসেবে অবধারিতভাবে এসে পড়ে কেন আবার একটি পত্রিকা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। বলা যেতে পারে শুধু সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ থেকেই নয়, দেশ এবং দেশের বাইরে বসবাসকারী যে সব বাঙালীরা আমাদের ফোরামের সদস্য এবং তাদের পরিচিত জনেদেরও একই সুত্রে বাঁধার এই বহুমুখী প্রয়াস। প্রত্যেক পাঠকেরই অন্তরে বাস করে একজন লেখক। প্রয়োজন শুধু গর্ত খুঁড়ে সেই স্বত্তাটিকে বের করে আনা। এ কাজে আমরা কতদূর সফল তার উত্তর অবশ্যই ভবিষ্যৎ দেবে, আজ শুধু বাঙালীর শ্রেষ্ঠ শারদোৎসবের প্রাক্কালে একে বনফুলের অঞ্জলি হিসেবেই ধরে নিলে ক্ষতি কি!

বিতর্ক

বিষয়ঃ বাংলা বই বৈদ্যুতিকরণে প্রকাশকদের কতটা ক্ষতি হচ্ছে

বাংলা বই -এর digitization কিন্তু পাবলিশাররা করেন না। ইংরেজি বই-এর ক্ষেত্রে কিন্তু অধিকাংশ সময় বিদেশী পাবলিশাররাই করে দেন এবং তার থেকে অর্থ উপার্জন করেন। Kindle, ipad মাধ্যম গুলোতে ইবুক বিদেশে এখন অনেক জনপ্রিয় ভারতবর্ষের চেয়ে, তাই পাবলিশাররা হার্ড কপি আর অনলাইন দুটোর-ই ব্যবস্থা রাখেন প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। অনলাইন ভার্সন কিন্তু কিনতে হয়, ফ্রি নয়। সাইবার আইন অনেক শক্তিশালী বিদেশে তাই বেআইনি ভাবে স্ক্যান করে ইবুক বানানোর ক্ষেত্রে মানুষ ভয় পায়। এ দেশে স্ক্যান করে ইবুক বানানো ও সেটার বহুল প্রচার ইদানিং দেখা দিয়েছে। পুরো ক্ষতি পাবলিশার বেচারার যে ছাপছে ৫০০০ বই কিন্তু অনলাইনে ৫০০০০ লোক সেটা পড়ে নিচ্ছে কারোর স্ক্যান করা ইবুকে। ৫০০০ বই-এর হয়তো ২০০০ বিক্রি হলো ৫ বছরে। কিন্তু যারা অনলাইন পড়লেন তাদের কাছ থেকে একটিও পয়সা পাওয়া গেল না। তাদের থেকে যদি ৩০০০ লোক-ও বইটি কিনতেন তাহলেই পাবলিশার খুশি মনে আরো ৫০০০ ছাপতে পারতেন। তাই দেখা যায় আজকাল বই-এর দ্বিতীয় মুদ্রণ, তৃতীয় মুদ্রণ আর দেখাই যায়না। সত্যজিত-এর বই-এর দ্বাদশ মুদ্রণ-ও দেখেছি আমার ছোট বয়েসে, এখন সেটাই পড়ছি বেআইনি ভাবে স্ক্যান করা ইবুক-এ। বড় প্রকাশকরা টিকে যাবেন কিন্তু মাঝারি আর ছোটরা ডুবে যাবেন যদি না তারা নিজেরাই ইবুক প্রকাশের দায়িত্ব নেন। প্রযুক্তিকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। মানুষ চায় ইবুক। প্রকাশকদের নিজেদের-ই এগিয়ে আসতে হবে। ওনাদের করা ইবুক হবে সরাসরি typeset করা পান্ডুলিপি থেকে , কোয়ালিটি চমৎকার - মানুষ নেবেই কারণ খরচা অনেক কম হবে।

- কৌশিক রায়

বই ডিজিটাইজেশন সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ ওঠে সেই গুলি হল - কপিরাইট লঙ্ঘন, বিশ্বাস ভঙ্গ, ও সেন্সরশিপ লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ। বিগত দুই- তিন বছরে সব চাইতে বিতর্কিত মামলা টি হল- গুগল বনাম পাবলিশার সংগঠন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। যাই হোক, উক্ত অভিযোগ গুলো অংশত বা পূর্ণ সত্য। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যখন রাষ্ট্রীয় শক্তি কোনও বই কে নিষিদ্ধ করে। তখন খোলা বাজারে সেই নিষিদ্ধ বই টি পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

শুধুমাত্র তাই নয়- যারা বিদেশ এ থাকেন, তাদের পক্ষে কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাষার বই সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না, সে ক্ষেত্রে ডিজিটাল বই তাঁর জানার ইচ্ছা সম্পূর্ণ করে। অন্য দিকে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তে পাবলিশাররা ইতিহাস রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদাসীন ! যার ফলে, অনেক পুরানো বই, পত্রিকাগুলি অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হয়, একমাত্র ডিজিটাল সংগ্রহ পারে সেই অমূল্য সম্পদগুলি রক্ষা করতে।

একমাত্র মুক্ত বই ডিজিটাইজেশন এই রকম পরিস্থিতিতে বই টি পাঠক এর কাছে পৌছাতে পারে। ওপেন সোর্স সফটওয়্যার আন্দোলন এর মতো মুক্ত বই প্রকাশ একটি মুক্ত চিন্তার প্রতীক। আসুন আমরা সবাই মিলে এই আন্দোলন কে এগিয়ে নিয়ে যাই।

- talk2devid

সকলেই চায় একজন মনের মতো বন্ধু। সবেতেই মনের মিল থাকবে, আচরণের মিল থাকবে এমন জীবনসঙ্গী তো সবাই চায়।

স্মরণজয়বাবুও তেমনটাই চেয়েছিলেন।

তাঁর বয়স যখন পনেরো, বাবার সঙ্গে হৃষিকেশ বেড়াতে গিয়ে পড়েছিলেন এক নাগা সাধুর খপ্পরে। তাঁর হাত ধরে টেনে বসিয়ে টকাটক করে কপালে চারটে গাঁট্টা ঝেড়ে দিয়ে সেই সাধু বলেছিলেন, "ওয়াহ! ক্যায়া নসিব বনায়া হ্যায় বচ্চে!

তু যো মাঙ্গেগা ঈশওয়র তুঝে জরুর দেগা, দেখ লেনা।"

ঈশ্বর মনের বাসনা পূর্ণ করবেন। এ কথা তো সব সাধুই বলেন। কিন্তু তবুও সেই সাধুকে বিশ্বাস করে একটাই মনোবাঞ্ছা পুষেছিলেন স্মরণজয়বাবু। আর আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর আগে বিয়ের জন্য পাত্রী পছন্দ করতে যাবার সময়ে কালীঘাটে গিয়ে চোখ বুজে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "মা গো, এমন একটা বউ দাও মা, যার সঙ্গে আমার মতের মিল, স্বভাবের মিল, চলনে-বলনে সবকিছুরই মিল হয়।"

ভক্ত যখন অন্তঃকরণ থেকে প্রার্থনা করে তখন ভগবানের বাপের সাধ্যি কী তা না শুনে পারে? ভগবান দিয়েই দিলেন স্মরণজয়বাবুর মনের মতো বউ।

আর সেইদিন থেকেই ফেঁসেছেন স্মরণজয়বাবু।

এই পঁচিশ বছরে তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি সবেতেই মিল থাকে তাহলে কোনও মতেই শান্তিতে থাকা সম্ভব নয়।

স্মরণজয়বাবু অফিস থেকে এসেই টিভিতে জীবজন্তুর চ্যানেল দেখতে বসে পড়তেন। তাঁর স্ত্রীয়েরও ওই চ্যানেল খুবই প্রিয়। দুজনেই সোফায় আয়েস করে বসে একসাথে দেখতেন। কিন্তু তাহলে রান্নাটা করবে কে? রান্না করতে যে তাঁরা কেউই ভালবাসেন না। অগত্যা বাধ্য হয়ে রান্নার লোক রাখা হল। বাজে খরচ।

স্মরণজয়বাবুর খুব গান গাওয়ার শখ। প্রতি রবিবার ভোরবেলায় হারমোনিয়াম পেড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত না গাইতে পারলে গলাটা কেমন যেন বাকুম বাকুম করে। কিন্তু তাঁর স্ত্রীয়েরও সেই বাতিক। তবে কিনা সেটা নজরুলগীতি এইটুকু যা ফারাক। দুজনের জন্য দুটো হারমোনিয়াম কেনা না হয় হল। কিন্তু একসঙ্গে দুজনেই গান ধরলে সুরতালটা বোঝা যায় কী করে? দুজনের জন্য আলাদা তবলচি একই সঙ্গে বাজাবেটাই বা কী করে?

রোজ খবরের কাগজ একসাথে পড়েন আর নতুন গপ্পের বই পেলে দুজনেই কাড়াকাড়ি করেন। তাই একই বই দুটো করে কিনতে হয়।

দুজনে মুখোমুখি হেঁটে এলে তো আর কথাই নেই। কেউ কাউকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না। যেন একে অপরের আয়না। ইনি যদি ভাবেন টেবিলের গা দিয়ে যাবেন তো উনিও ভাবেন তাই। ইনি ভাবলেন দেওয়াল ধরে যাবেন তো উনিও সেই মুহূর্তে সেটাই ভেবে বসে আছেন। বেশ খানিক্ষণ এরকম চলার পরে দুজনেই একইসঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন নেন।

একই কারণে দুজনের জন্য দুটো একইরকম দেখতে বাথরুমও বানাতে হয়েছে।

তাঁদের একমাত্র ছেলে শাক্যব্রত হবার পরে তাঁদের তো আরও অসুবিধে। দুজনেরই তাঁদের আদরের খোকাকে একসাথে কোলে নিতে ইচ্ছে করে, আবার দুজনেরই একই সাথে হাত টনটন করে ওঠে। তবে একটু বড় হতেই শাক্য দেখল তার পোয়াবারো। বাবা মা দুজনেই তার জন্য একই আইসক্রিম কিনে আনছেন। অবশ্য অনেক সময়ে তাতে বিপত্তিই হত বেশি। ইনি বলছেন আমারটা আগে খা, উনি বলছেন আমারটা আগে। অনেকসময় দেখা যেত দুজনেই রেগেমেগে আইসক্রিম মাটিতে আছাড় মেরে পা দিয়ে পিষছেন।

তবে আসল সমস্যা এল আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। দুজনেরই মাথায় কী একটা অসুখ করে ভুলে যাবার রোগে ধরল। তাতে স্মরণজয়বাবুর চাকরিটারও যায় যায় অবস্থা হল। বাধ্য হয়ে তিনি স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে একটা স্টেশনরি দোকান দিলেন। নিজে কিছুই মনে রাখতে পারেন না দেখে একজন বিশ্বাসী কর্মচারীও রাখলেন। স্ত্রী তাঁকে ডেকে বললেন, "হ্যাঁ গো, তোমার খুব তো শখ ছিল তোমার সঙ্গে তোমার গিন্নির সবকিছু পাই টু পাই মিলে যাবে। দুজনের ঠিকুজি-কুষ্টি, এমনকি নামটাও পর্যন্ত।

তোমার নাম স্মরণজয় আর আমার নাম স্মৃতিকণা। দুজনের ভাগ্যে কী নাচছে এবার বুঝছ তো? এবার শান্তি হল? আর কোনওদিন নিজের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে বউ আনবে!"

না, আর কোনওদিন বউ আনবেন না স্মরণজয়বাবু। ম্যাচিং বউ তো কক্ষণও না। এমন দুর্ভোগ চরম শত্রুরও যেন না হয়। যত বেশি অমিল হবে তত বেশি মজা, ততই বৈচিত্র এ কথা তাঁর মতো আর কে বুঝল! ভগবানকে কত বিশ্বাস করেছিলেন তিনি, আর এখন মাঝে মাঝেই বিরক্ত হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেন, "ভগবান তুমি ওপরেই বসে থাকো, নিচে নেমো না।"

এই গত বছরেরই ঘটনা। রোজকার অভ্যেসমতো সূর্যোদয়ের আধঘন্টা আগে ঘুম থেকে উঠতে অ্যালার্ম দেওয়া সত্ত্বেও দেরি করে ফেলেছিলেন। তাঁর আর কী দোষ, এই ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন ধরেই হচ্ছিল। মোবাইলে অ্যালার্ম সেট করাই থাকে। অ্যালার্ম যখন বাজে তখন সেটা তিনি তা কানে দিব্যি শুনতেও পান। কিন্তু ঘুমের ঘোরে কিছুতেই মনে করতে পারেন না সেটা কীসের আওয়াজ। কোনওদিন ভাবেন ঝিঁঝিপোকা ডাকছে, কোনওদিন ভাবেন কুকুরে কামড়াকামড়ি করছে, তো কোনওদিন ভাবেন পাশের বাড়িতে চোর এসে বাসনপত্র ফেলছে। বিড়বিড় করে তিনি "ভাঙ ভাঙ, আরও ভাঙ" বলে মৃদু হেসে পাশ ফিরে শুয়ে পড়েন।

তা, সেদিনও স্মরণজয়বাবু ভোরবেলায় সামান্য দেরি করে উঠে সূর্য নমস্কার করছিলেন। পাশে যথারীতি স্মৃতিকণাদেবীও ছিলেন। একটু আগেই সেরে ফেলেছিলেন স্মৃতিদেবী। স্মরণজয়বাবুর দিকে না তাকিয়েই বললেন, "আজকে চায়ে একটু আদা দিতে বলি, কী বলো? ঠাণ্ডাটা যা পড়েছে।"

স্মরণজয়বাবু ধীরেসুস্থে প্রণামটা সেরে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, "তোমাকে কতদিন বলেছি না, মোরগ নমস্কারের সময়ে কথা বলবে না?"

"মরণ! আজকে আবার মোরগ কোথায় দেখতে পেলে?"

স্মরণজয়বাবু বললেন, "তার মানে? মোরগ কাকে বলে তাও ভুলে গেলে? আরে, যেটা সারাদিন আলো দেয়, সর্দির সময়ে যার দিকে তাকালে হাঁচি পায় সেটা হল মোরগ। যার জন্য এ জীবজগৎ বেঁচে আছে, যাকে ঘিরে এই পৃথিবী আর গোটা মোরগজগতের গ্রহগুলো ঘুরছে তাকে বলে মোরগ। শীতকালে ছাদে উঠে তুমি যার দিকে পিঠ করে বসে উল বোনো, গরমকালে যার তাপ থেকে বাঁচতে লোশন লাগিয়ে ছাতা খুলে রাস্তায় বের হও তাকে বলে মোরগ। ওই যার দিকে তাকাতে গিয়ে তুমি এখন ভুরু কুঁচকে কপালে হাত দিয়ে ছায়া বানাচ্ছ, আগুনের যেই থালাটাকে সকালবেলায় ওই সজনেগাছের ফাঁক দিয়ে উঠতে দেখলেই টিনের চালে উঠে ধোপাদের ওই হতচ্ছাড়া সূর্যটা লাল ঝুঁটি ফুলিয়ে কুক্কুরকুউ বলে ডেকে ওঠে সেই নক্ষত্রকেই বলে মোরগ। মনে পড়ছে এবার? হুঁঃ, যত্তসব ভুলোমনা নিয়ে হয়েছে আমার সংসার!"

"ইঃহিঃহিঃহিঃহিঃহি!" জোরে হেসে উঠলেন স্মৃতিদেবী, "তোমার তো মাথাটা শুকিয়ে একেবারে লেড়ো বিস্কুট হয়ে গেছে গো। চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে রোজ কে খাচ্ছে বলো তো দিকিনি! আরে, কোঁকরকোঁ করে যেটা ডাকে তাকে বলে মোরগ, আর আকাশে যেটা দেখছ সেটাকে বলে খোকা। মনে পড়েছে এবার? রোজ সকলে উঠে খোকা-নমস্কার করছ, আর আজকে তাকে বলছ মোরগ!"

এবার স্মরণজয়বাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "কী যা তা বলছ? আকাশের ওটা খোকা? তাহলে ঘরে —"

স্মৃতিদেবী এবার বেশ রেগে গেলেন। স্মরণজয়বাবুকে থামিয়ে দিয়ে চাপা গলায় দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "চেঁচিও না তো! সূর্যটা ঘরে ঘুমোচ্ছে। উঠে পড়বে যে। বেচারা কাল অনেক রাত করে শুয়েছে।"

বিরক্ত হয়ে স্মরণজয়বাবু আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন, "ভগবান তুমি ওপরেই বসে থাকো, নিচে নেমো না।"

এই তো অবস্থা।

তবে হ্যাঁ। ভগবান যাকে দুর্দশা দেন, তারই জন্য তিনি বেশি কাতরও হন। তারই কাছে নিজের দূত পাঠান অন্ধকারে আলোর সন্ধান দিতে।

তাই তো সেইদিনই দুপুরবেলায় এক দেবদূত এসে স্মরণজয়বাবুর বাড়ির দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "বাড়িতে কেউ আছেন?"

"কে?" স্মরণজয়বাবু সাড়া দিলেন।

"স্যার, আমার নাম দেবদত্ত দত্ত। অক্সফোর্ডের একটা দুর্দান্ত পিকচার ডিকশেনরি আছে স্যার। ছবি দিয়ে বাংলায় আর ইংরেজিতে লেখা। একবার হাতে নিয়ে —"

"না না ওসব লাগবে না। বাড়িতে আমি সেলাইমেশিন অ্যালাউ করি না।"

"সেলাইমেশিন কোথায় স্যার?"

"এই তো তুমি। বাড়ি বাড়ি জিনিস বেচে বেড়াও, সেলাইমেশিন না তো কী!"

"সেলসম্যান, স্যার।"

"ওই হল। তোমাদের সেল করার একটা বাজে ম্যানিয়া আছে। একদম অ্যালাউ করি না।"

"স্যার, একটা অফার ছিল।"

"ছিল তো আজ এসেছ কেন? যেদিন ছিল সেদিন এলেই পারতে।"

"না মানে স্যার, আজকেই আছে।"

"আজকে আছে তো ছিল বললে কেন?"

বেগতিক বুঝে দেবদূত যখন হাঁটা লাগিয়েছে, তখনই পিছন থেকে স্মরণজয়বাবুর তেইশ বছরের ছেলে শাক্য ডাকল। সে বুঝেছে যে ঠিক এই জিনিসটাই সেই মুহূর্তে তার বাবামায়ের সবচেয়ে বেশি দরকার।

দেবদূত কোন দেবের মুখ দেখে সকালে উঠেছিল কে জানে, একই ফ্যামিলি তার থেকে দু'কপি মোটা মোটা পিকচার ডিকশেনরি কিনে নিল।

বাবা আর মাকে একটা করে পিকচার ডিকশেনরি গিফট করে শাক্য বলল, "আর ঠিক একবছর বাদে তোমাদের টোয়েন্টিফিফথ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। তোমরা বেড়াতে যেতে এত ভালবাসতে আর ভুলোমনা হবার পরে একদম ঘরে বসে থাকো। তাই আমি চাই নেক্সট ইয়ার তোমরা তোমাদের ফেভারিট জায়গা কন্যাকুমারী বেড়াতে যাও। খরচা আমি দেব। প্লিজ না কোরো না। এই বইটা সবসময়ে সঙ্গে রাখবে, যখনই দরকার হবে দেখে নেবে। তাহলে একবছরে তোমাদের ভুলে যাওয়া অনেক কমে যাবে। মনে রাখবে, এটা তোমাদের গীতা।"

স্মরণজয়বাবু হেসে বললেন, "সে কী রে! এই কচি বয়েসে তুইও ভুলে যেতে শুরু করলি! এটা তো ডিকশেনরি। ঠাকুরঘরে যা, গীতা দেখতে পাবি।"

তা, সেই কন্যাকুমারী যাবার দিন এসে পড়ল। আজ থেকে আর ঠিক চারদিন বাদে স্মরণজয়বাবু আর স্মৃতিকণাদেবীর পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকী। গোটা একবছর ধরে নিজেদের তৈরি করেছেন তাঁরা। আগের মতো অতোটা ভুল এখন হয় না। ভুল হলে হাতের কাছে পিকচার ডিকশেনরি তো আছেই।

বিকেলে হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়বে। গোছগাছ শেষ করছেন স্মরণজয়বাবু আর তাঁর স্ত্রী স্মৃতিকণাদেবী। বাড়িতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকা হয়েছে। তাঁরা মাসখানেক বাড়িতে থাকবেন না, এই সময়ে ফ্যানগুলো খুলে নিয়ে গিয়ে ইলেক্ট্রিশিয়ান সেগুলোকে সার্ভিস করিয়ে রাখবে।

শাক্য বাড়িতে নেই। সে গুরগাঁওতে নামকরা কোম্পানীতে চাকরি করছে। এই বয়সেই সে বেশ দায়িত্ববান। কী কী নিতে হবে, বেরোবার সময়ে বাড়ির কোন কোন জানলা বন্ধ করতে হবে সব বিস্তারিতভাবে লিখে রেখে এসেছে সে।

কিন্তু তাতেও কি ভুল ঠেকানো যায়! সবকিছু রেডি করে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরোনোর মুখে স্মরণজয়বাবুর মনে পড়ল কী বিশাল ভুল তিনি করেছেন। দুজনে মিলে যুক্তি করেছিলেন হাজীর দোকান থেকে মাটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ আনিয়ে নেবেন, সঙ্গে থাকবে চিকেন তন্দুরি। সেইমতো ফোন করে অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এইমাত্র মনে পড়ল অর্ডারের টাইমটা ভুল দেওয়া হয়ে গিয়েছে। বিকেল চারটে দশে ট্রেন, আর তিনি চারটেতেই খাবার ডেলিভারি দিতে বলে দিয়েছেন। এখন আড়াইটে বাজে। স্টেশনে অন্তত একঘণ্টা আগে পৌঁছনো দরকার। তাই এক্ষুণি বেরোতেই হবে। তার মানে, সে-খাবার তাঁদের ভাগ্যে জুটল না।

দরজা বন্ধ করতে করতে চরম বিরক্তিতে স্মরণজয়বাবু আকাশের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "ভগবান তুমি ওপরেই বসে থাকো, নিচে নেমো না।"

দুজনে মিলে একটা ট্যাক্সি নিয়েছেন। মালপত্তর লিস্ট মিলিয়ে তুলে ট্যাক্সির কাচ বন্ধ করে শালটাকে ভাল করে জড়িয়ে বসে আছেন স্মরণজয়বাবু। শুধু কানের কাছে স্মৃতিদেবী মাঝে মাঝেই বলে চলেছেন, "হ্যাঁ গো, আমরা কিন্তু কিছু একটা যেন ভুলে যাচ্ছি।"

স্মরণজয়বাবু জানেন যে এটা তাঁর স্ত্রীয়ের বরাবরের স্বভাব। তাই তাতে পাত্তা না দিয়ে চোখ বুজে গনগনে ধোঁয়া ওঠা হাজীর মাটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ দেখতে পেলেন। গন্ধও যেন পেলেন। জিভটা রসিয়ে উঠল। মুখটা হাঁ করে কামড় বসাতে যাবেন, হঠাৎ কন্যাকুমারীর ঢেউ এসে চিকেনের ঠ্যাংম্যাং ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। জলের ঝাপটায় চোখ পরিস্কার হয়ে দূরে দেখা গেল বিরিয়ানির মাংসের চাঁইটা সমুদ্রের একটা বড় পাথর সেজে জেগে আছে শুধু।

"রোককে ড্রাইভার, রোককে!"

চমকে উঠে চোখ খুললেন স্মরণজয়বাবু। স্মৃতিদেবী ডান হাতের তর্জনীটা নাক বরাবর বাড়িয়ে ধরেছেন। হিন্দুস্থানী ড্রাইভার হতভম্ব। স্মরণজয়বাবু বললেন, "কী গো, কী হল আবার?"

"এটা কী?"

ঝট করে পিকচার ডিকশেনরির পাতা উলটে দেখে স্মরণজয়বাবু হেসে বললেন, "তাই বলো, ওটাই ভুলে যাচ্ছিলে? ওটা হল আঙুল। ওকে বলে তর্জনী।"

"আরে দূর বাবা! ঠিক করে বলো।"

ডিকশেনরির পাতাটা স্মৃতিদেবীর নাকের ডগায় ধরে স্মরণজয়বাবু বললেন, "ঠিকই বলেছি। এই দ্যাখো।"

"ধ্যাত্তেরি! তোমার দ্বারা হবে না। ড্রাইভার ভাইয়া, বলিয়ে তো ইয়ে ক্যায়া হ্যায়?"

ড্রাইভার স্মৃতিদেবীর আঙুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "সাব তো সহি বোলা, মেমসাব। ইয়ে তো আপহিকা উঙ্গলি হ্যায়।"

"ধুত্তোর উঙ্গলির নিকুচি করেছে!" স্মৃতিদেবী রেগেছেন, "আরে বাবা, হামারা উঙ্গলি জিসকো তাগ কর রাহা হ্যায় উও ক্যায়া হ্যায়?"

ট্যাক্সির উইন্ডস্ক্রিনের সামনে একটা মালা পরানো মা লক্ষ্মীর ছোট্ট ছবি রয়েছে। স্মৃতিদেবী সেইটাতেই আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন। কিন্তু সেটা যে কী জিনিস স্মরণজয়বাবুরও সেই মুহূর্তে পেটে আসছিল অথচ মুখে আসছিল না। ডিকশেনরি খুলে সেরকম কোনও ছবিও পেলেন না। আর ড্রাইভার বলল, “হাঁ মাজি। হাম রকখা হ্যায়। হাম হিন্দু হ্যায় তো, ইস লিয়ে রকখা হ্যায়।”

“আরে ভাই রকখা হ্যায় তো সমঝা। লেকিন ক্যায়া রকখা হ্যায়? ধ্যার বাবা, হামারা বাতহি নেহি বুঝ রাহা হ্যায়!” স্মৃতিদেবী অসহিষ্ণু।

“অজিব বাত করতে হ্যাঁয় মাজী, আপনে বাত্তি জ্বলায়ে কাহাঁ কে বুঝ নহি রাহা হ্যায়?”

এবারে হাল ধরলেন স্মরণজয়বাবু, “সুনো ড্রাইভারজী, ইয়ে যো তুমহারা মাজী হ্যায় না, ইয়ে জরা ভুলক্কর হ্যায়। তুম ব্যস ইতনা বতা দো কে উস ফোটোমে জো হ্যায় উও ক্যায়া হ্যায়।”

“আপ তো ভুলক্কর নহি হ্যায় না, আপ হি বতা দিজিয়ে।”

“লেকিন ড্রাইভারজী, ইনকে সাথ রহতে রহতে ম্যায় ভি ভুলক্কর হো গয়া হুঁ।”

“অজীব আদমি হ্যায় আপলোগ। ইয়ে লকশমিজীকা ফোটু হ্যায়, অওর ক্যায়া!”

“লকখিজীকো ক্যায়া কহেতা হ্যায়?” স্মৃতিদেবী জিজ্ঞাসা করলেন।

“লকশমিজীকো মাতা কহতে হ্যাঁয়, অওর ক্যায়া!”

“আরে, মতলাব ইয়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দূর্গা, কালী, শিব, নারায়ণ, গণেশ এদের সব এক শব্দমে ক্যায়া কহেতা হ্যায়?”

“ঈশওয়র কহতে হ্যাঁয়, অওর ক্যায়া!”

“অওর ক্যায়া কহেতা হ্যায় ওহি তো হাম পুছতা হ্যায়।” স্মৃতিদেবী রীতিমতো হাত পা ছুড়তে লেগেছেন। ধৈর্য ক্রমশ হারাচ্ছেন।

“ভগওয়ান কহেতে হ্যাঁয়, অওর ক্যায়া!”

“এইত্তো মনে পড়েছে! তোমাকে পঞ্চাশ টাকা বেশি ভাড়া দেব। হ্যাঁ গো, তাড়াতাড়ি ভগবানকে ফোন করো।” স্মৃতিকণাদেবী স্মরণজয়বাবুর দিকে ফিরে বললেন।

শুনে ড্রাইভার খইনিতে তালি দিয়ে হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বলল, “অজীব পাগল হ্যায় তো আপলোগ। রানচি যা রহে হ্যায় ক্যায়া?”

কিন্তু ড্রাইভারের কথায় কর্ণপাত না করে স্মরণজয়বাবু সত্যি সত্যি তাঁদের ইলেকট্রিশিয়ান ভগবান রায়কে মোবাইল থেকে ফোন করলেন। ফোনটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে স্মৃতিদেবী বললেন, “হ্যালো! ভগবান, তুমি এখন কোথায়?”

“ওপরে আছি, আর কোথায়!” ভগবান কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল, “আমনাদের বাড়িতেই তো আটক হয়ে বসে আচি। ভাল আক্কেল তো আমনাদের! ভগবানকে ঘরের মধ্যে আটকে নিজেরে ফূর্ত্তি কচ্চেন! কী ক্ষতি করেচি আমনাদের যে এরম শাস্তি দিচ্চেন! সব কাজ সেরে দোতলা দিয়ে নীচে নামতে যাব, বাবু চিল্লিয়ে বললেন, ‘ভগবান তুমি ওপরেই বসে থাকো, নীচে নেব না’। আমি ভাবলাম আরও কাজ আচে বোধহয়। তা না, আমনারা তালাচাবি মেরে পাইলে গেলেন! আমার মুবাইলে ব্যালেস নেই বলে ফুনও করতে পারচি না।”

স্মৃতিদেবী বললেন, “ভগবান তুমি কিছু মনে কোরোনা ভাই। তুমি যে ওপরে সেটা আমাদের খেয়াল ছিল না। তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমরা গিয়ে খুলে দিচ্ছি। ড্রাইভারভাইয়া, ওয়াপাস ঘর চলো।”

তাড়াহুড়ো করে বাড়ি পৌঁছে ভগবান রায়কে খুলে দিয়ে স্মরণজয়বাবু তার হাতে পাঁচশোটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, "ভগবান, তুমি এত কষ্ট করলে তো, তাই তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। তুমি দরজার বাইরেটায় চারটে অবধি দাঁড়াও, হাজী থেকে ভাল ভাল খাবার দিয়ে যাবে, তুমি আর তোমার বউ পেট পুরে খেও, কেমন! আমরা যাই গো দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ভগবান রায় বলল, "হ্যাঁ, এখন নিজেরা দোষ করেচেন তো, তাই আমনাদের পেসাদ ভগবান খাবে।"

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

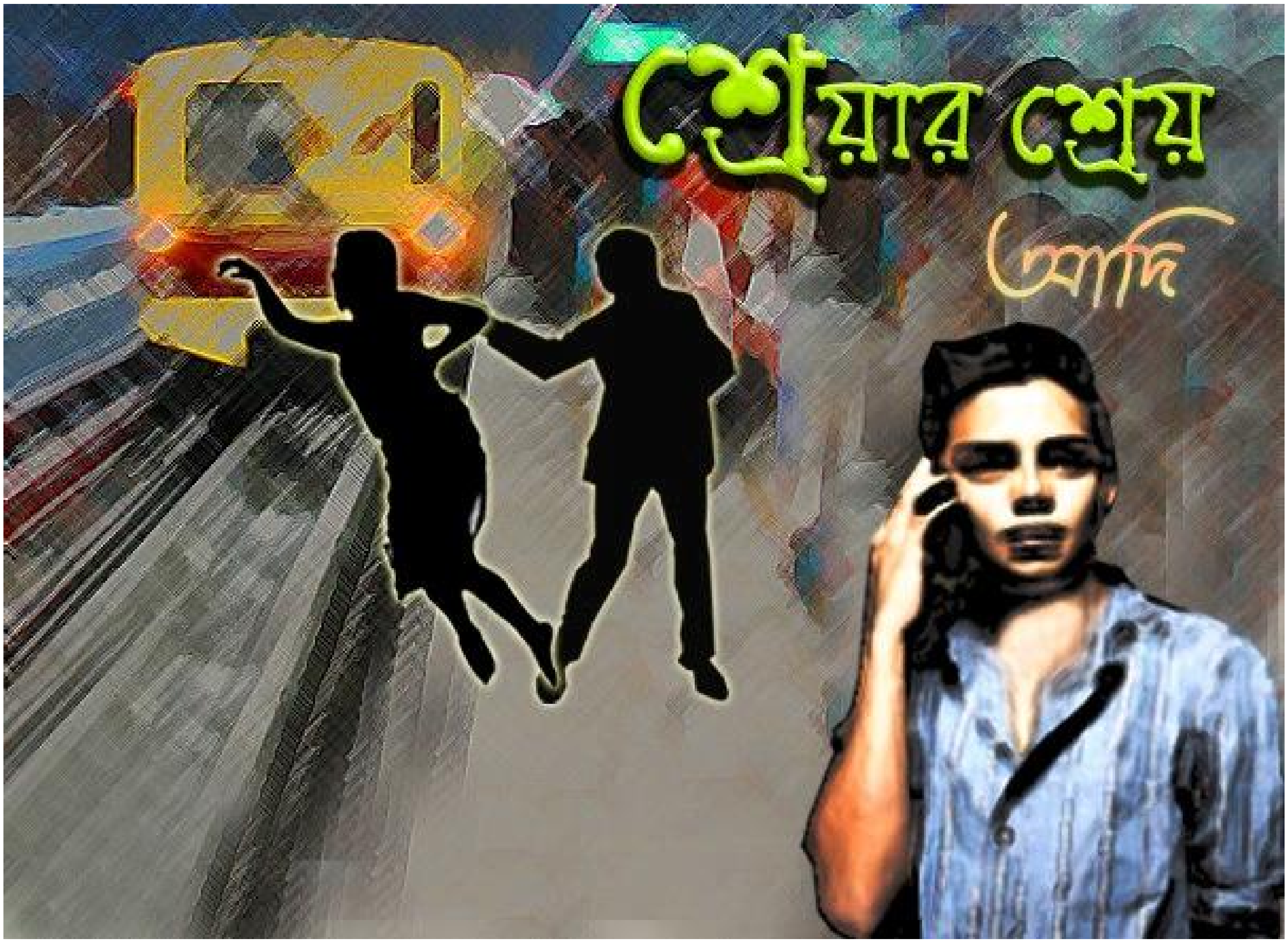

"তিন বার?" আঁতকে উঠল শ্রেয়।

রঞ্জনবাবু দুঃখের সাথে বললেন, "হ্যাঁ, তুমি একটু খেয়াল রেখো বাবা। তোমরা বন্ধুরা ছাড়া ওর আর কেই বা আছে?"

"আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আঙ্কল, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা বাবা, রাখি? ফোন কোরো মাঝে মাঝে, ওর সাথে কথা বোলো। বড় একা হয়ে থাকে ও সবসময়।"

ফোন করার আগে শ্রেয় জানত না যে শ্রেয়া হসপিটালে। পাঁচটা ঘুমের ট্যাবলেট এবারের জন্য যথেষ্ট হয়নি। পরলোক যাত্রা আবারও তার ভঙ্গ হল।

* * * * *

ফিজিক্স কোচিনে একইদিনে ভর্তি হতে এসেছিল তারা। সেদিন সকালে প্রথম দেখেই শ্রেয়াকে চিনেছিল শ্রেয়। এই সেই মেয়ে, যাকে একদিন মেট্রো ষ্টেশনে সুইসাইড করতে বাধা দেওয়ায়, পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল টালিগঞ্জ ফাঁড়ির জনসমুদ্রে। ভর্তির সময় শ্রেয়ার মামনি খুব তারিফ করে বলেছিল, "মেয়ে আমার পড়াশোনায় কখনো ফাঁকি দেয় না।" শ্রেয় একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল মামনির দিকে। কে জানতো যে সেদিনই মামনির সাথে তার প্রথম ও শেষ আলাপ?

শ্রেয়াকে শ্রেয়-এর প্রথম ভালো লাগলো একটা ঘটনার পর।

স্যার-এর চ্যালেঞ্জ মতো সবাই ১থেকে ৩৬পর্যন্ত মৌলের নাম মুখস্ত করে গেছিল সেদিন। সবাই বলতে পারলেও একদমে একমাত্র শ্রেয়-ই পারল।

হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম . . . . . . সেলেনিয়াম, ব্রোমিন, ক্রিপ্টন

হাততালি দিয়ে উঠেছিল শ্রেয়া। যদিও ও ছাড়া আর সবাই অস্বীকার করল। বলল, "ও পুরোটা বলতে পারেনি স্যার, শেষের দিকটা গোঁ গোঁ করে কাজ সেরেছে।"

সেদিন একমাত্র শ্রেয়া-ই সাপোর্ট করেছিল তাকে।

এরপর একমাস যখন ক্লাশে এলোনা শ্রেয়া, বাধ্য হয়েই স্যারকে জিজ্ঞাসা করল শ্রেয়, "স্যার, শ্রেয়া আর কোচিনে আসছে না কেন?"

"ওর মা মারা গেছেন", বেশ দুঃখের সাথেই বললেন স্যার।

মনটা খারাপ হয়ে গেল তার।

* * * *

সেদিন ছিল ২৮শে মে। মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের দিন। সকালে কোচিনে গিয়ে হাতে চাঁদ পাবার মতোই সুযোগটা পেয়ে গেল শ্রেয়। "ইন্টারনেট ঘাঁটায় তুমিতো ওস্তাদ, তা নেট থেকে শ্রেয়ার মার্কস গুলো দেখে আমায় একটু ফোন করে জানিও তো", এই বলে একটি কাগজ বাড়িয়ে দিলেন স্যার তার দিকে। কথা বলার একটা বাহানা তো পাওয়া গেল। এরপর কোচিন ছুটির সময় সর্বচক্ষুর অন্তরালে স্যার-এর স্টুডেন্টস ডায়েরি থেকে শ্রেয়ার ডিটেলসের পেজটা ছিঁড়ে নিল সে।

ঘরে ফিরে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে আগে শ্রেয়ার-ই মার্কস দেখল। ভালো মার্কস পেয়েছে শ্রেয়া। ভাবলো এই সুযোগটা ছাড়া যাবে না। সুখবরটা শ্রেয়াকে দিয়ে যদি ওর মার দুঃখটা একটু হালকা করা যায়। এই ভেবে পেজটা দেখে ডায়াল করল সে, ৯৮৩........... ফোনটা তুলে ওপাশ থেকে "হ্যালো" শুনে প্রথমটা থমকে যায় শ্রেয়। তারপর যখন শুনল উনি শ্রেয়ার বাবা এবং শ্রেয়া তার মার কাছে যাবার জন্যে পাঁচটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে সুইসাইড অ্যাটেম্পট করে এখন হসপিটালে ভর্তি, তখন অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে গেল শ্রেয়-এর বুক। প্রশ্নটা না করে পারলনা শ্রেয়, "তবে দুমাস আগে মেট্রো ষ্টেশনে..........."

কথা শেষ হবার আগেই রঞ্জনবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সেবার ওর মার সাথে আমার ঝগড়া হওয়ায় বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল ওর মামনি। হাজার ডাকা সত্ত্বেও আসতে রাজি না হওয়ায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায় শ্রেয়া। বুঝতেই পারিনি যে সুইসাইড করতে যাচ্ছে। একটি ছেলে সেবার ওকে প্রায় মেট্রোয় ঝাঁপ দিতে দিতে আটকায়। বড় ভালবাসতো ওর মাকে। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?"

"আমিই ছিলাম ওই ছেলেটি।"

শ্রেয় অজান্তেই কবে যেন ভালবেসে ফেলেছিল শ্রেয়াকে।

এরপর ওকে অনেক বার ফোন করার চেষ্টাও করেছিল শ্রেয়, কিন্তু রঞ্জনবাবু সেই সময় হসপিটালে না থাকায় কিছুতেই আর কথা হয়নি শ্রেয়ার সাথে। শ্রেয় এবার বুঝল স্যার-এর স্টুডেন্টস ডায়েরিতে লেখা নম্বরটা শ্রেয়ার নয়, ওর বাবার।

* * * * *

আসল ঘটনাটা ঘটল ২৭শে জুন।

সকাল ৯টা নাগাদ ফোনটা বেজে উঠল শ্রেয়-এর। নম্বরটা দেখে বুঝল রঞ্জনবাবু ফোন করছেন তাকে। তাড়াতাড়ি ফোনটা তুলে "হ্যালো" বলতেই, ওপাশ থেকে নম্র কণ্ঠস্বরে ভেসে এল, "বাবা, আজ তো বড়িশা হাই স্কুলে ফর্ম দিচ্ছে, আর আমি এখন হসপিটালে আছি। যেতে একটু দেরি হবে। তুমি প্লিজ শ্রেয়ার নামটা লিখিয়ে দিও, আমি দুপুরের দিকে নিউআলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুলে যাব মেয়ের জন্যে ফর্ম তুলতে।"

"আঙ্কেল, শ্রেয়ার সাথে একটু........"

বিপ...

বিপ......

বিপ.........

ফোনটা কেটে দিয়েছেন।

অটোয় যেতে যেতে একটা কথাই ভাবছিল শ্রেয়, রঞ্জন আঙ্কেল কি করে জানলেন যে সেও আজ বড়িশা হাই স্কুলের ফর্ম তুলতে যাবে। হঠাৎই মনে পড়ে গেল কোচিনে স্যারকে একবার বলেছিল যে সে বড়িশা হাই স্কুলেই ভর্তি হবে।

কি মনে হতে মোবাইল বের করে একটা ফোন করল শ্রেয়।

"তোদের স্কুলে আজ ফর্ম দিচ্ছে?"

সৌম্য বলল, "কই না তো। সে তো ২৯শে।"

হয়তো ভুল খবর পেয়েছেন রঞ্জন আঙ্কেল, এই ভেবে শ্রেয় ফোন করলো ওনাকে। এটা বলার জন্যে যে "আজ আর কষ্ট করে যাবেন না, আজ নিউআলিপুরে ফর্ম দিচ্ছে না।"

কিন্তু উত্তেজনার বশে সে ভুলে গিয়েছিল যে নিউআলিপুর মাল্টিপারপাস নামে একটি গার্লস স্কুলও আছে।

ফোন করল সে।

ক্রিং... ক্রিং...

ক্রিং... ক্রিং...

কেউ তুলল না। কেটে গেল।

আবার করলো।

ক্রিং... ক্রিং...

ক্রিং... ক্রিং...

দা নাম্বার ইউ হ্যভ ডায়াল্ড, ইজ কাররেণ্টলি সুইচড অফ।

শ্রেয় ভাবল এটা কেমন হল? রিং বেজে তারপর বলছে সুইচড অফ?

সে আবার করলো।

ক্রিং... ক্রিং...

"হ্যালো?" গলা শুনে বুঝতে পারলো এটা শ্রেয়া।

"হ্যালো, আঙ্কেল আছেন?"

"না। বাবা তো বাড়িতে।"

"ফোনটা কি ফেলে গেছেন?"

"না। এটা তো আমার ফোন। আমি শ্রেয়া।"

"কিন্তু আমি তো তোমার বাবার নম্বর ডায়াল করেছি।"

"এটা তো আমার নম্বর। ৯৮৭৪৪......"

"আমি তো ৯৮৩...... ডায়াল করেছি। আর আমার কাছে তো তোমার নম্বরও নেই।"

"কি জানি! কিছু গণ্ডগোল হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই।"

শ্রেয় ফোনটা কানে ধরেই কি যেন ভাবছিল।

"হ্যালো!

হ্যালো!"

কেটে গেল ফোনটা।

শ্রেয় বুঝতে পারছিলনা শ্রেয়ার সাথে তার প্রথম বাক্যালাপ হওয়ায় সে খুশি হবে না এই রহস্যের সমাধান খুঁজবে।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

ছোটগল্প

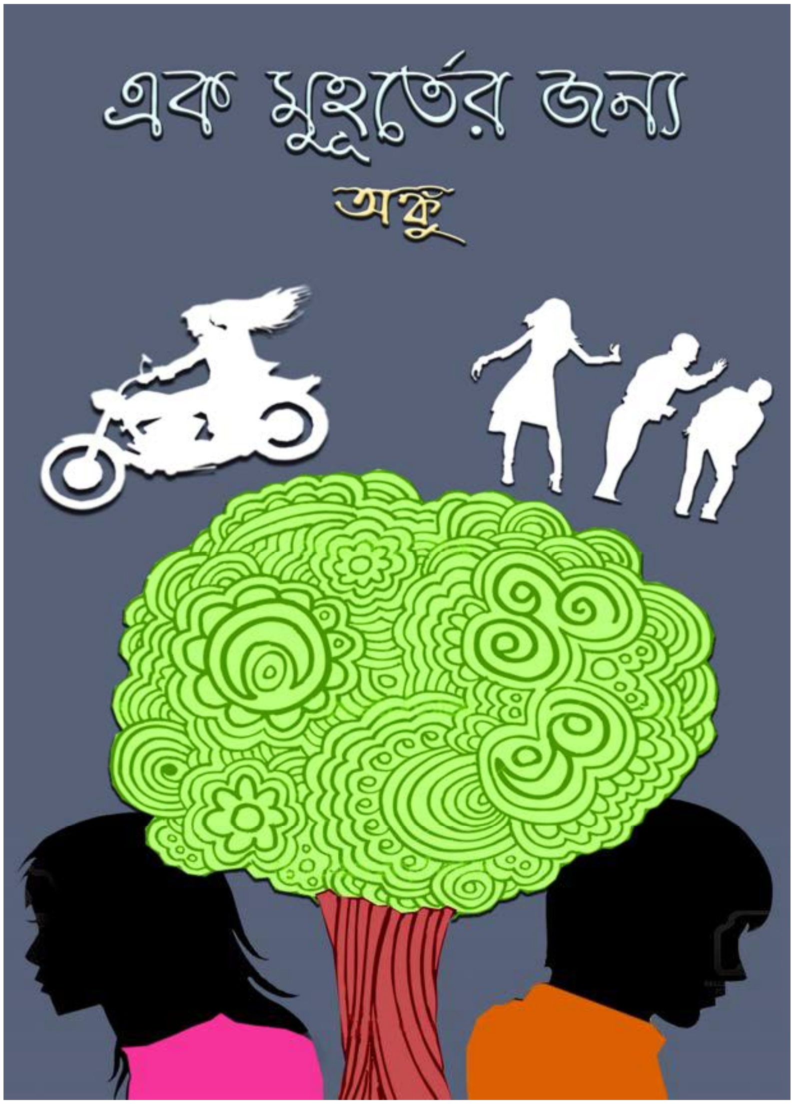

শীতকালে সকাল শুরু হতে দেরিই হয়। ছ'টা বেজে গেছে এখনও রাস্তাঘাটে স্বাস্থ্যসন্ধানীরা বেরোতে পারেনি লেপের আমেজ ছেড়ে। আমাদের আর্ট কলেজের আধ খাওয়া চাঁদের মত বারান্দায় গতরাতের কীর্তি ছড়ানো। দেওয়ালের দিকে সফটড্রিঙ্কসের একটা ক্রেট বেঁচে আছে মনে হচ্ছে| খাওয়ার জল তো নেই কোথাও আপাতত ফ্রুটি খেয়ে তেষ্টা মেটাই। দুটো ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ফ্রুটির বোতল

নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। কাল ছেলেরা পুবের হলঘরে আর মেয়েরা পশ্চিমের হলঘরে শুয়ে ছিল। ওহ না, বলতে ভুল হল কেউ তো কাল রাত্রে নিজে শুতে যাওয়ার অবস্থায় ছিলো না। মাল খেয়ে টাল হওয়ার পর তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে শোয়াতে হয়েছিল। এখন এদের কারোর একটা ঘুম ভাঙলেই আমি বাড়ি পালাবো। গত তিনদিন ধরে কলেজেই পড়ে আছি। আমি বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম, ফ্রুটি খাব বলে।

"কি রে কখন উঠেছিস?" দেবারতী উঠে পড়েছে।

"এই তো কিছুক্ষন হল। ফ্রুটি খা।" দেবারতীকে একটা ফ্রুটির বোতল দিলাম। এবার আমি কেটে পড়ব।

"ফ্রুটি!" দেবারতী মুখ ভ্যাঙ্গচালো। "আর বিয়ার নেই?"

"সকালে উঠে আর বিয়ার খায়না সোনা।এই ফ্রুটির বোতল ধরো, আর আমাকে ছাড়ো।"

"তোকে আমি ধরে রেখেছি কই?"

"তাহলে তুই ওদেরকে ওঠানোর ব্যাবস্থা কর। এবার আমি বাড়ী পালাব।"

"আর কিছুক্ষণ থাক না বাড়ী বাড়ী করছিস কেন? আজই তো শেষ, আর তোকে কেউ আসতেও বলবে না"

ফ্রুটির ফুরিয়ে যাওয়া ক্যানটা দেবারতী ছেলেদের দরজায় ছুঁড়ে মারল। আর একই সাথে চন্দনও দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। ক্যানটা সোজা গিয়ে চন্দনের নাকে লাগল। আহা আহা করে দেবারতী ছুটে গেল। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে মনের আনন্দে বাহা বাহা করতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল দিনটা বেশ ভালোই যাবে।

আমি বাড়ী যাবার জন্য ঘর থেকে ব্যাগটা নিয়ে এসে দেখলাম দেবারতী চন্দনকে সেবাশুশ্রূষা করে তাকে দুপায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

"কি রে দাঁড়া না। এত তাড়া কিসের বাড়ি যাবার। কে বসে আছে এই সাতসকালে তোর জন্য দরজা খুলে।" দেবারতী যথারীতি আমাকে আটকে দিল।

"আরে আমার কাজ আছে।"

"জানা আছে কি কাজ তোর। তুই তো ঘরে গিয়ে এখন মোষের মত পড়ে পড়ে বেলা বারোটা অবধি নাক ডাকাবি।"

চন্দন-ও এগিয়ে এল – "হ্যাঁ তোর ঘুমের জন্য কাকিমার ভোরের ঘুমটা নষ্ট করবি কেন? আর ভাব পাড়ার লোক যদি দেখে তুই ভোরের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি ফিরছিস। ছিঃ ছিঃ কি ভাববে তারা।"

চানু ব্যাটার এই ভাঙ্গা নাকটা আমাদের কথার মধ্যে গলানোটা আমার একদম পছন্দ নয়।

দেবু আবার তাতে নোলক পরালো - "এই রকম আঁধারী ভোরে কারা ফেরে ঘরে? লালপাড়ায় যায় যারা, আর ফেরে চোরে।"

আমি চানুকে উপেক্ষা করে দেবুকে বললাম "না হয় আমি বাড়ি গিয়ে ঘুমুবোই তাতে তোদের কি?"

চানু বুকে হাত রেখে করুন সুরে গেয়ে উঠলো – "আমারি বঁধুয়া আনবাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া"

ফ্রুটির ক্রেটটা চন্দনের মাথায় ভাঙ্গার ইচ্ছা হলেও আমি নিজেকে কন্ট্রোল করলাম। সেকেন্ড ইয়ারের পর থেকে ওর সাথে আমি আর কথা বলিনা। না কথা বলিনা নয়, আমি ওর কথা শুনতে পাইনা, এমনকি আমি ওকে দেখতেও পাইনা ; মোদ্দাকথা ওকে আমি অদৃশ্য বলে মনে করি। কোন উত্তর না পেয়ে একটু ব্যাজার হয়ে চন্দন দেখলুম কোথায় কেটে পড়ল।

দেবারতী আমাকে ঘরে টেনে এনে বসালো মেঝেতে পাতা গালিচার উপর। "জল খাবি। মাথা ঠান্ডা হবে।"

আমি ভ্রু কুঁচকে তাকালাম দেবারতী-র দিকে। "তুই জানিস আমি ওই চেনো শালাকে সহ্য করতে পারি না।"

"না না চানুটা অসহ্যকর বটেই কিন্তু আজ তো শেষদিন ছেড়ে দে না।" দেবারতী স্বাভাবিক স্বরে বললেও আমার মনে হল ও যেন মুখ টিপে হাসছে। "তা বাপু তুমিও তো কম ঠোঁটকাটা নও।"

আমি ঠোঁটকাটা তা সবাই বলে। যদিও আমি তা মনে করিনা কখনোই। আমি জানি আমি সত্যিকথা বলি। মানে যাকে বলে সজ্ঞানে সত্যিকথা। এই নিয়ে বন্ধু মহল আমায় কম জ্বালায় না। স্কুল থেকেই আমি যুধিষ্ঠাত্রী-র (যুধিষ্ঠীরের মহিলা সংস্করণ) আসনে বসে আছি। সত্যি বলতে কি আমি বুঝিনা আমার বন্ধুরা কেন মিথ্যা কথা বলে অহরহ। ছোটবেলায় আলুকাবলি খেলে - মিথ্যে, আইসক্রিম খেলে – মিথ্যে, তারপর শরীর খারাপ হলে আরেক চোট মিথ্যে বলত ওষুধ খাওয়ার জন্য, তা মাঝেমাঝে পেটের বদলে ওষুধ পিঠেও পড়ত। বড় হয়ে সিনেমা দেখতে যাবে – বলবে এক্সট্রা ক্লাস, প্রেম করতে বেরবে – তাও বলবে বন্ধুর বাড়ি নোট নিতে যাচ্ছি। আরে এত পড়লে তো সবাই ক্লাস-এ ফার্স্ট হয়ে যাবে। আমার মিথ্যা কথা বলার দরকার পড়েনি আজ অবধি। আমি নোট নেওয়া থেকে প্রেম করতে যাওয়া সবটাই বাড়ীতে বলে যাই। তা বাড়ীতে বলে যাবনা তো কি। আজকাল যা দিনরাত্রি পড়েছে আমি বেরলাম একটা কোন ব্যাটা অ(ল্প)চেনা ছেলের সাথে প্রেম করতে আর সে আমায় খুন করে দিল। তা বাড়িতে তো কেউ জানতেই পারবে না। এক্ষেত্রে ব্যাটার তাড়াতাড়ি জেল হবে অন্তত। আমার বাড়ির লোক আমায় সিনেমা কি প্রেম করাতে খুব একটা বাধা দেয়নি কখনো। আর আমি যদি বাড়িতেই না মিথ্যে বলি তো আমার বাইরের লোকেদের মিথ্যে বলার প্রয়োজন কোথায়? মানুষ বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় কাটায় সেখানেই যদি তার মিথ্যের না দরকার থাকে তো বাইরের লোকের সাথে তো কয়েক মিনিটের কথোপকথন। তাতেও মিথ্যে বলে আমার বন্ধুরা। আছে শ্যামবাজারে বলবে বাগবাজারে। স্যর নতুন আঁকা দিয়েছে, ক্লাসে থাকা সত্ত্বেও ন্যাকা ন্যাকা করে বলবে - না কই আমি তো জানিনা। আর ছেলেগুলো তো মিথ্যের মহাসাগর। আমি দেখতে পাচ্ছি সেদিন রূপার রঙের টিউব থেকে আধা রঙ দেবল নিয়ে নিল নিজের প্যালেটে তা রূপা এসে যখন চেঁচামিচি করছে তখন স্বীকার কর, তা নয়। আমি বললাম বলে আমার সাথে কি ঝগড়া। তা স্বীকার করলে কি হত! রূপা খেয়ে নিত তোকে ? চারটে গালাগালি দিত, বড়জোর রঙ-এর দামটা আদায় করত। বুঝিনা বাপু এদের ব্যাপারস্যাপার। নাহ আমার কোনদিনই দরকার পড়েনি মিথ্যে বলার। আমি ওদের মত সকাল সন্ধে মিথ্যে বলতে চাইও না। তাতে লোকে আমায় যুধিষ্ঠাত্রী বললেও আমার কিছু আসে যায় না। এই নামটাই বা কে আবিষ্কার করেছে ওই অনামুখো চেনো ছাড়া।

"কি রে কি ভাবছিস যুধিষ্ঠাত্রী? আনবাড়ি-র কথা?" দেবারতী-র কথায় চমক ভাঙল। "চন্দনকে বলে এলাম চা-এর ব্যাবস্থা করতে।একেবারে চা খেয়ে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে যাবি।"

নাহ ও চেনো হতচ্ছাড়াকে আমি ক্ষমা করব না। এ জীবনে নয়।

চন্দন চিরকালই এরকম। প্রথম প্রথম ভাবতাম ছেলেটা তড়বড়ে বলে এইসব করে। আহা বাচ্চা ছেলে ভুল করে কাজটা করে ফেলেছে। তাছাড়া করতে তো চেয়েছিল ভাল কাজই কিন্তু ভুল হয়ে গেলে কি আর হবে।

সেই ফার্স্ট ইয়ারে দাদাদিদিদের বর্ষবিদায়ের অনুষ্ঠানের জন্য আমরা গেছিলাম এক ব্যান্ডের গায়কের বাড়িতে। ব্যাণ্ডের বয়স বা নাম কোনোটাই তখন খুব বেশি না তাবে গায়কের হাবভাব দেখলে তা মনে হচ্ছিল না। আসলে সেবারে বিভিন্ন কারনে আমাদের ফান্ডে টাকা বেশি ওঠেনি, তাই কম টাকায় পুষ্টি সবার সন্তুষ্টি জোগাড় করতে গেছিলাম। তাও তো আবার শুধু সোলো সিঙ্গারে হবে না, ব্যান্ড দরকার, সারা রাতের জন্য। ঝ্যাং ঝ্যাং।

অনেক খুঁজে একটা দল পেয়েছিলাম যারা কম টাকায় রাজি হয়েছিল। তাও আমাদের রেটে কুলোচ্ছিল না। নয়নদা, দেবারতী, চন্দন আর আমি গেছিলাম। যদি হাতে পায়ে ধরে কিছু কমে রাজি করানো যায় তাই আর কি।

নয়নদা খুব ভাল কথা বলে। কি সুন্দর কথা বলে বলে ওদের কে আমাদের সাধ্যের মধ্যে নিয়ে চলে এল। সব কথা দিনটিন ঠিক হয়ে যাবার পর আমরা যখন উঠতে যাব তখন আরেক জন এসে হাজির। সে ভদ্রমহিলা আবার কোন দুঃস্থদের টাকা দেবে বলে টাকা তোলার জন্য অনুষ্ঠান করছেন। সেই ভদ্রমহিলা যেই না বলতে শুরু করেছেন "বাবা তুমি আমার ছেলের

মতন, তোমাকে দেবার মত টাকা তো নেই ...”। আমরা সব সুড়সুড় করে বেরিয়ে সোজা গলি থেকে বড় রাস্তায়। যদি ওনার বিনি পয়সার ভার আমাদের ঘাড়ে এসে পরে। এই সম্পূর্ণ ঘটনায় সাথে থাকা সত্ত্বেও চন্দন কোনো রকম কথা বলেনি। তাই আমরা ভুলেই গেছিলাম যে ও আমাদের সাথে আছে কি নেই। বাসে ওঠার সময় নয়নদা হঠাৎ বলল “আরে চন্দন কই?” সত্যি তো চন্দন তো নেই আমাদের সাথে। দেবারতী আর নয়নদার কাজ আছে বলে বাসে উঠে কেটে পড়ল। আমি আবার বড় রাস্তা থেকে গলি খুঁজে গিয়ে পড়লাম সেই ব্যান্ড মাষ্টারের বাড়ি। গিয়ে দেখলাম চন্দন তুমুল ঝগড়া করছে সেই দুঃস্থ সেবাব্রতী ভদ্রমহিলার জন্য ব্যান্ডের গায়কের সাথে। আমি যখন গিয়ে পড়েছিলাম তখন ঝগড়ার শেষ পর্যায়ে। তারপরেই ব্যান্ডের বাকী ছেলেরা মিলে চন্দনকে পাকড়াও করে গলির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর ওর মুখের উপর আমাদের কন্ট্রাক্ট পেপার তা ছিঁড়ে ফেলে দিল।

পরে শুনেছিলাম ওই ভদ্রমহিলার অনুষ্ঠানে ওই ব্যান্ড গান গেয়ে বহু টাকা তুলে দিয়েছে। আর আমাদের নিজেদের পকেট থেকে এক্সট্রা টাকা দিয়ে অন্য দল আনতে হয়েছে।

এবার আমাদের যাওয়ার পালা। গতকাল-ই আমাদের বিদায় অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। সারারাত্রি হুল্লোড় চলেছে। ব্যান্ড এসেছিল। নামী, দামী-ও বটে। এখন-ও সবাই ঘুমুচ্ছে। শাল সোয়েটার ক্যানভাস যে যা পেরেছে গায়ে দিয়েছে এই ঠান্ডায়। যারা কালকে রাত কলেজে কাটিয়েছে তারা থার্ড ইয়ার সবাই। রাত বারোটায় ব্যান্ডের গান শেষ হওয়ার পর বাচ্চারা সব বাড়ি চলে গেছে।

“এই সাত সকালে চা পাবি কোথায়?” একটা হাই চেপে জিজ্ঞাসা করলাম দেবারতীকে।

তাচ্ছিল্যের শব্দ করে দেবারতী বলল “চানু বুঝবে।”

“বাকিদের জাগা না”।

“বাদ দে, যার যখন ইচ্ছা হবে সে তখন উঠবে। আজ তো আর ক্লাস নেই।” দেবারতী আবার শুয়ে পড়ল।

চন্দনের সাথে আমার প্রথম কথা হয়েছিল অর্ধেক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর। সেবার দোলের পরের দিন বেশ কিছু ছেলেমেয়ে মিলে মজা করে আমাদের ঘরের দরজার উপরে রং-এর বালতি রেখে দিয়েছিল। ওর ভেবেছিল হয়ত কোন বন্ধু আসবে আর দরজা খুললেই তার ঘাড়ে বালতি পড়বে। দেবল দেখেও এসেছিল যে বারান্দা ধরে আমাদের একটা ছেলে আসছে। কিন্তু হিসাবনিকাশে কি ভুল হয়ে গিয়েছিল জানা নেই। ওই ছেলেটার আগেই বিশাখাদি চলে এসেছিল। তারপর তো ভুত (থুড়ি পেত্নি) হয়ে যাওয়া বিশাখাদি হেডুকে নিয়ে এলেন আমাদের ঘরে। তারপর হেডু কূটনৈতিক জেরা শুরু করলেন।

“কে কে কাজটা করেছ বলে দাও তাহলে আমি কাউকে শাস্তি দেব না”

....

“না বললে সবাইকে ক্লাস থেকে একমাসের জন্য সাসপেন্ড করে দেব।”

..................।

বিশাখা ম্যাম আমাকে বললেন “তুই তো মিথ্যা কথা বলিস না তাহলে তুই কিছু বলছিস না কেন?”

এক্ষেত্রে আমি জানিনা বলাটাও মিথ্যে, তাই বা বলি কি করে। তাই চুপ করে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হল। বিশাখাদির সমস্ত রাগটা আমার গালে ফেটে পড়ল। আমরা সবাই এক মাসের জন্য সাসপেন্ড হয়ে গেছিলাম।

তারপর একদিন আমি আর চন্দন ক্লাসে বসে গল্প করছিলাম। তাতে ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করল “হ্যাঁ রে তুই সেদিন বিশাখাদির কাছে আমাদের নামগুলো বললি না কেন? তুই তো মিথ্যা কথা বলিস না।”

“সেদিন তো আমি মিথ্যে বলিনি।”

“চুপ করে থাকাটাও কি একধরনের মিথ্যে নয়?”

"না" – এরপরে আমি ওকে সেই আজন্ম সত্য কথা বলে নরকে যাওয়া সেই মুনির গল্পটা ওকে বলেছিলাম। যার সত্য কথা বলার জন্য অনেকগুলো নিরপরাধের প্রান গিয়েছিল। তখন ভগবান বলেছিল কখনো কখনো সত্য বলার থেকে চুপ করে থাকা মঙ্গল।

তারপর থেকে আমি যুধিষ্ঠাত্রী।

"হাই গার্লস" দরজায় দেখি দেবল এসে দাড়িয়েছে। দেবল হল দেবারতীর তরে উচ্ছুক্ত করা ছাগশিশু। টুয়েলভ থেকে ওরা চরে বেরাচ্ছে। মানে দেবারতী দেবলকে গলায় দড়ি পড়িয়ে চড়াচ্ছে।

"চন্দনকে চা আনতে বলেছে দেবু, আয় বস" আমি ডাকলাম দেবলকে।

দেবল ডাকল "না তোরা বাইরে আয়। এত সকালে উঠিনি কখনো, সকালটা বেশ সুন্দর।"

দেবারতী উঠে পড়ল, আমায় জিজ্ঞাসা করল - "আসবি বাইরে?" আহা এই প্রশ্নের আড়ালে আছে, - আসবি যদি বাইরে , দেব এক ঘাড়ে।

"না তোরা যা, চা এলে বলিস"। চলে গেল ওরা।

একটু পরে বাইকের আওয়াজ পেলাম। এ কি রে চানুকে চা আনতে বলে কোথায় কেটে পড়ল দুটো?

প্রথম প্রথম আমিও বেড়াতাম ওরকম চানুর বাইকে চেপে। তবে ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষার পরে যা ঘটল তাতে বুঝলাম চানুর বাইকটা খুব একটা সেফ নয়। সেই যে বার দেবল-যুগল আর চন্দন আর আমি গেছিলাম সিনেমায়। দেবলের বাইকের পিছনের সিটটাতো দেবারতীর বুক করাই থাকে সবসময়। চন্দনের বাইকে ছিলাম আমি। রাত্রিবেলা ফিরছি সিনেমা দেখে। একটা গলির ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, কোত্থেকে একটা উজবুক গাড়ি এসে ঠুকে দিল চন্দনের গাড়িতে। ব্যাটা নিজে ঠুকে দিয়ে আবার সে কি হম্বিতম্বি। আমি ভাবছি এবার বোধহয় চন্দন কিছু একটা বলবে। কারন দোষটা গাড়িটারই। গাড়ীর চালক অজস্র গালিগালাজের সাথে মেয়েছেলে নিয়ে ঘুরলে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞান বর্ষণ করে চলে গেল। চন্দনের ব্যবহারে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। হতচ্ছাড়া অন্য সময় মুখে কথার খই ফুটছে আর এখন কোন কথা নেই।

গাম্বাটটা বাইকটা খাড়া করছিল আমি ওর মাথায় একটা চড় মেরে খিঁচিয়ে উঠলাম "এই গাড়ল কিছু বললি না যে লোকটাকে?"

"বলা উচিত ছিল তাই না? হ্যাঁ, ওই তো আমার বাইকে ধাক্কাটা মারল।"

আমি এরপরেও আর ওর বাইকে উঠতাম কি! বাসে করে হোক, পায়ে হেঁটে হোক, যেভাবেই হোক বাড়ী ফিরতাম কিন্তু ওর বাইকে নয়। কিন্ত ওই যে দেবলরা এসে গেল আর আমায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার ওর বাইকে তুলে দিল। যেই বড় রাস্তায় পড়লাম অমনি ট্রাফিক পুলিস ধরল আমাদেরকে। এই সব সময় সবাই চেষ্টা করে কোনমতে কিছু দিয়ে পুলিসকে কাটাতে।

"এই থাম থাম। যাচ্ছিস কোথায় দাঁড়া।"

চন্দন শান্ত ছেলের মত বাইক থামাল।

"এই কার বাইক এটা? কাগজ পত্র আছে? হেলমেট কই ? জানিস না এই রাস্তায় হেলমেট ছাড়া যাওয়া বেআইনি?"

চন্দন খুব শান্তভাবে বলল "তাতে তোর কি?"

পরবরতী ফলাফল হিসাবে আমাদের দুজনকে হয়ত সারা রাত থানায় কাটাতে হত। কিন্তু দেবল ছিল ভাগ্যিস। ওর মেজকাকা কোন থানার মেজবাবু। তার সাথে কথা টথা বলে পুলিশগুলো ছেড়ে দিল আমাদের। চন্দনকে ওর পাওনা দু চারটে চাপড়ের বেশি কিছু দেয়নি। আমি আর চানুর বাইকে চাপি না।

এখন কেউ এল না এরা সব গেল কোথায়? সুতপা দেখলুম উঠে পড়েছে। ওকে বলে আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে হাঁটা দিলাম। আর কোনো কাজ নেই। আর কেউ ডাকবেও না কাজ করার জন্য। শেষ হয়ে গেল আমাদের তিন বছরের হাসিকান্না। এবার যে যার রাস্তায়। রাস্তাই বটে। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। কয়জন আর ছবি এঁকে পেট ভরায়। বেশির ভাগই অন্যান্য কাজে নেমে পড়বে। আজকাল থীমপুজো হয়ে তাও আমাদের কিছু কাজ বেড়েছে। তা না হলে ওই বাণিজ্যিক ছবি এঁকেই বা কয়দিন চলে। তবে অ্যানিমেশানে আমাদের দাম আছে। ওটা একটা সান্ত্বনা। আমার মাস্টারপিসগুলো আমি কাল দুপুরেই বাড়ি নিয়ে চলে গেছি এক্সিবিশন শেষ হতেই। গত বছর যা হয়েছিল তার পরে আমি আর কোনও দিনও ওগুলো ফেলে রাখি।

আমাদের সেকেন্ড ইয়ার এক্সিবিশনের সময় আমাদের প্রত্যেককে পাঁচটা করে আঁকা জমা দিতে বলা হয়েছিল। মাস তিনেক লেগেছিল সেগুলো শেষ হতে। তারপর আমরা হাঁফ ফেলার সময় পেয়েছিলাম একটু। সেরকম একদিন আমরা হলে বসে গল্প করছি। চারপাশে ইজেলে সদ্য শেষ হওয়া ছবি। আমরা ওই সব ছবির বিভিন্ন রং-এর মিসেল নিয়ে কথা বলছি। চন্দন হঠাৎ বলল রঙটা কোনো ফ্যাক্টর নয়, আঁকাটা আঁকতে হবে ভিন্ন স্টাইলে। সবাই ওকে চেপে ধরে বিদ্রুপ করতে সুরু করে দিল। “আবিষ্কার করেছিস নাকি এমন কিছু?” “দেখি তোর মাস্টারপিস”। চন্দন তো প্রথমে কিছুতেই বলবে না। তারপর প্রচুর পিছনে লাগার পর সে বলল “জিনিসটাকে বাস্তবের সাথে মেলাতে হবে। যেমন ধর আঁকবি একটা ময়ুর। সেটা আঁকতে হবে বাস্তবে ময়ুর হয়ে তাহলে বুঝবি ময়ুর হলে কেমন লাগে আর ফিলিংসটা ফুটে উঠবে ছবিতে।”

“তাই নাকি। তা ভাই চন্দন; সোনা ছেলে আমাদেরকে একটা ছবি এঁকে দেখানা।” আমার কথায় বাড় খেয়ে কেন যে চন্দন রাজি হল আঁকতে। একটা ইজেল ঠিক করে সে পাশে একটা টুলে রঙ ঢেলে তুলিটা টুল থেকে একটু বার করে টুলের ওপর রাখল। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললো – “তোরা একটু দূরে সরে যা সবাই। একটু মনযোগ না হলে এসব ছবি আঁকা যায় না।” আমরা সবাই একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলাম। ও প্রথমে জামাটা খুলে ফেলল। দেবারতী আমার কানে কানে বলল “খালি গায়ে ফিলিংসটা ভাল আসবে বুঝতে পারছিস না?” আমি দেবারতী-র কানে আক্রমন করার আগেই অবাক চোখে দেখলাম চন্দন দু হাতের উপর ভর দিয়ে পা দুটো শূন্যে তুলে দিল। তারপর হাতে ভর করে খানিকটা টলমল করে ইজেলের কাছে গেল। তারপর পায়ের বুড়ো আঙ্গুল আর পাশের আঙ্গুল দিয়ে তুলিটা চেপে ধরে রং-এর বাটিতে চুবিয়ে ক্যানভাসে একটা দিব্যি নীলচে দাগ টানল। আমরা চন্দনের পাগলামিতে এতটাই অবাক হয়েছিলাম যে স্যার কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি।

“কী হচ্ছে কি এটা?”

ঘরে ছোটখাট একটা বাজ পড়ল। চন্দন ইজেল ক্যানভাস তুলি রঙ সব নিয়ে উলটে পড়ল। একটু দূরে আমার এক্সিবিশনের জন্য আঁকা ক্যানভাস রাখা ছিল। আমার একটা মাস্টারপিস নীল রঙে চুবে গেল।

পরে শুনেছি চন্দন নাকি দেবলকে বলেছিল সেদিন ধ্যানযোগী আঁকাটাই উচিত ছিল, কিন্তু ততদিনে চন্দন আমার কাছে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সকালের আলো মোটামুটি ফুটে গেছে। রাস্তায় লোকজনও নেমে পড়েছে। শাল সোয়েটার মাফলার আর বাঁদুরে টুপির ভিড়। কুকুরগুলোকে হাই তুলতে দেখে আমারও ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। বাড়ি ফিরে সোজা বিছানায়। কাল সারারাত ঘুম হয়নি তাই এত সকালে উঠেছি নয়ত এটা ত আমার মধ্যরাত। চায়ের দোকানগুলোর ঝাঁপ খুলছে দেখলাম। এক চায়ের জন্য অপেক্ষা করব কিনা ভাবতে ভাবতেই দেখি গলির মুখে একটা ফ্লাক্স আর বেশ কিছু চায়ের ভাঁড় নিয়ে আসছে চন্দন। ওর হাতের চা খেতে আমার বয়েই গেছে। বরং ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে এই চা-এর দোকান থেকে চা নেওয়া যাক। চন্দন দেখলাম বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে।

"কাকু এক কাপ চা হবে?"

"বসতে হবে এখন স্টোভ জ্বালিনি।"

আহা বসতে হবে তো আমি জানি। চন্দনের ভ্যাবাচ্যাকা মুখটা দেখে মনের মধ্যে কদম ফুটছিল। বেশ বেশ। আমি দোকানের সামনের আধভাঙ্গা বেঞ্চটায় বসলাম। চন্দন প্রায় সামনে এসে দাড়িয়েছে। যাতে ওর মুখ দেখতে না হয় তাই আমি সামনের রাস্তার দিকে তাকালাম। কদম গাছটার তলায় দুটো বয়স্ক মতন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। চন্দন বাতাসকে উদ্দেশ্য করে বলল "আমি তো চা আনলুম"। চন্দন তো অদৃশ্য। অদৃশ্য মানুষ কথা বললে তাকে শোনাও যায় না। আমিও চন্দনের কথা শুনতে পেলাম না। সামনের ভদ্রলোকদের বোধহয় কোনো অসুবিধা হচ্ছে একজন মুখবিকৃত করে কি একটা বলছেন অন্যজনকে। চন্দন চা ঢালছিল একটা ভাঁড়ে, বোধহয় ভেবেছে আমি খাব। সামনের ভদ্রলোকের হঠাৎ দেখলাম মুখটা কেমন বেঁকে গেল। উনি এক হাতে বুকটা খামচে ধরে টলে গেলেন তারপর ধপাস করে বসে পড়েলেন মাটিতে। অন্যজন ধর ধর রব তুলে ওনাকে সামলাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা কি বুঝে ওঠার আগেই আমার পায়ে একটা অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল আর চন্দন "শোয়াবেন না, শোয়াবেন না" বলে ছুটে গেল ওদের দিকে। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম চন্দন ভাঁড় ভরতি গরম চা আমার কোলে ফেলেছে। দোকানদারের কাছ থেকে জল নিয়ে কামিজটা ধুতে লাগলাম। ইচ্ছা করছিল পুরো ফ্লাক্সটাই চন্দনের মাথায় ঢেলে দি। জল দিতে জ্বলুনিটা একটু কমল। চন্দন-এর খোঁজে চারিদিক তাকিয়ে দেখি সেই ভদ্রলোকের চারপাশে বেশ ভীড় জমে গেছে। আমিও ভীড় ঠেলে সামনে গেলুম। দেখলুম ওই ভদ্রলোক আধা শুয়ে আছে আরেকজনের কোলে আর চন্দন তার বুকে মালিশ করছে। চন্দনকে দেখেই আমার মাথাটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আমি কিছু বলার আগে আমাকে এবং চারপাশের ভীড়কে স্তম্ভিত করে চন্দন লোকটার বুকে দুম দুম করে কিল মারতে সুরু করল। চন্দনের কাজকর্ম দেখে আশেপাসের লোকেরা আঁতকে উঠল।

"ও দাদা এ কী করছেন" "পাগল নাকি" "ভেবেছেটা কী মেরে ফেলবে নাকি" "এই ছোঁড়া ছাড় বলছি তা না হলে তোকে আমরা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দেবো" আশেপাশের লোকজন তেরিয়া হোয়ে উঠেছে। আমার বেশ আনন্দ হল, আমাকে আর কিছু করতে হবে না লোকগুলোই চন্দনকে উচিত শিক্ষা দেবে। আর, পাবলিকের মার, দুনিয়ার বার।

একজন চন্দনের কলার ধরে টান দিতেই আমার এক মুহূর্তের জন্য কি যে হল। আমি লোকটার হাত চেপে ধরে ভারী গলায় অবলীলাক্রমে জীবনের প্রথম মিথ্যে কথাটা এক হাট লোকের মাঝখানে বললাম - "আমরা মেডিকেল কলেজের লাস্ট ইয়ারের স্টুডেনট। আপনি কি জানেন হার্টের পেসেনটকে কিভাবে ট্রিট করতে হয়?" আমার চশমা আর আওয়াজে লোকটা থেমে গেল। চন্দন রাস্তায় কাত হয়ে পরেছিল উটকো টানে। উঠে বসে বলল "ওই তো ওনার জ্ঞান ফিরছে। জল দিন, জল কই?" ভাগ্যিস ফিরেছে। না ফিরলে লোকে চানু-র সাথে আমাকেও ধরে পেটাত এরপর। হাতে হাতে জল দুধ চলে এল চায়ের দোকান থেকে। ভদ্রলোক দেখলাম জলটল খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। আমি ওনার সাথের লোকটাকে বললাম "কাকু ওনাকে এক্ষুনি কোন ডাক্তারখানায় নিয়ে যান।" যে লোকটা চন্দনের কলার ধরে টেনেছিল সে আবার ক্ষমা চেয়ে নিল ওর কাছে "বুঝতে পারিনি ভাই যে তুমি ডাক্তার। আসলে তুমি হঠাৎ করে অমন করলে।"

আমি আবার চায়ের দোকানে এসে বসলুম। আমার ঝোলাটা ওখানেই পড়েছিল। এই ডামাডোলে কেউ নিয়ে যায়নি ভাগ্যিস, তাহলেই ষোলোকলা পূর্ণ হত। চন্দন ও দোকানে এল। দোকানদার চা বানিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে। চন্দন সসংকোচে বলল "চা খাবি"। চোখাচোখি হতেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "দে"। চানুর জন্য আমার আজীবনের নীতি ভেঙ্গে গেল বলে আমার কোন অনুশোচনা হচ্ছিল না, এমনকি চানুর উপর রাগও হচ্ছিল না। আমি দেখলাম ওই কদমগাছটার তলায় একটা রিক্সা দেকে এনে ওই দুজন ভদ্রলোক উঠছেন তাতে। জীবন খুব সুন্দর, মিথ্যের প্রলেপ লাগলে আরও সুন্দর। শীতকালেও বাতাসে কোথা থেকে কদমফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

গিটার

অঞ্জন দত্ত

বেশ কিছুক্ষন খুঁজে বাড়িটা পাওয়া গেল।

“একটু দাঁড়াও ভাই, “ আমি রিক্সাওয়ালাকে বললাম, “এই নাও ভাড়া, আমি একটু বাড়ির ভেতরে খোঁজ নিয়ে আসছি...“ মা রিক্সায় বসে রইলেন।

আমি রজত সেন, বয়স ২৬। আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে, নভেম্বরের এক রবিবার বিকেলে আমি আর মা টালিগঞ্জে একটি পাত্রী দেখতে এসেছি।

একটা উঁচু দেয়াল ঘেরা বাড়ি, বন্ধ দরজা, কলিং বেল টিপলাম।

দরজা খুলে গেল। বেশ বড় দোতলা বাড়ি – সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, বাগান।

একটা মেয়ে দরজা খুলল, বেশ ভালো দেখতে। মেয়েটি আমাকে দেখে যেন খুবই অসন্তুষ্ট হ’ল – কঠিন, গম্ভীর মুখ, ভ্রু কোঁচকানো, চোখে খুব রাগী একটা চশমা।

"বলুন, কাউকে খুঁজছেন?"

"আচ্ছা, এটা কি ৩০ নম্বর, মিস্টার মৃণাল ঘোষের বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের পাত্রী দেখতে আসার কথা ছিল – চিঠিতে লিখেছিলাম, আমরা আজ আসবো..."

"কোন্ মেয়েকে দেখতে আসার কথা ছিল?"

"কোন মেয়ে মানে? আমরা উমাকে দেখতে এসেছি – যে খুব ভালো গিটার বাজায়..."

"ওহ, আসলে দুই মেয়ের জন্যই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তো। কিছু মনে করবেন না, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

"দমদম থেকে – দেখুন, মা রিক্সায় বসে আছেন। মাকে কি ভেতরে আসতে বলব?"

"ওহ, সরি – নিশ্চয়ই। আগে বলবেন তো..."

মেয়েটি প্রায় দৌড়েই রাস্তায় চলে গেল। মাকে হাত ধরে রিক্সা থেকে নামাল আর ভেতরে নিয়ে এল। আমরা বড় একটা হলঘরে গিয়ে বসলাম।

"আপনারা এখানে বসুন, আমি বাড়ির লোকদের খবর দিচ্ছি..."

এই বলে মেয়েটি ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা জল বের করে দুটো গ্লাসে ঢেলে আমাদের দিল – আর দুটো প্লেটে দুটো বড় তালশাঁস সন্দেশ আমাদের সামনে রাখল।

"প্লিজ, একটু জল খান। আমি আসছি..." এই বলে মেয়েটি চলে গেল।

"বাঃ, কি ভালো মেয়ে, " মা বললেন, "কি ভালো ব্যবহার, তবে, একটু গম্ভীর। কিন্তু এই মেয়েটি কে? আমরা যাকে দেখতে এসেছি সে তো চশমা পরেনা..."

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক লোক চলে এল। আমাদের দেখে সবাই বেশ খুশী হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছিল। আমাকে সবাই খুব ভালো করে দেখছিল, আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিল। এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী আমার সঙ্গে নানান কথা বলে যাছিলেন, আমাকে অনেক কিছু জিগ্যেস করছিলেন।

মা এক বয়স্কা মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

"আমার মেয়ে বড়, বিয়ে হয়ে গেছে," মা বললেন, "আর এই একটাই ছেলে, রজত, একটা রাষ্টায়ত্ব ব্যাঙ্কে জুনিয়ার অফিসার..."

মহিলা বললেন, "এ আমার বড় মেয়ে রুমা আর এই যে আমার জামাই, শ্যামল, ইন্ডিয়ান অয়েলে আছে। আর এ আমার ছোট মেয়ে মায়া, যাদবপুরে এম.এস.সি পড়ছে..."

মায়াও বেশ সুন্দরী, লম্বা, ফরসা।

"আপনার মেজ মেয়ে উমা কোথায়?" মা বললেন, "ওকে দেখতেই তো আমরা এলাম..."

"উমা আসছে, " মহিলা বললেন, "ওদের বাবা বাইরে থাকেন। ফেব্রুয়ারীতে দু'মাসের ছুটি নিয়ে আসবেন, দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে যাবার ইচ্ছে। তাই আমরা দুই মেয়ের জন্যই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। মায়া ৫'৭", মানানসই লম্বা ছেলে আর পাচ্ছি না। রজত, তোমার হাইট কতো?"

আমি বললাম, "৬'১"

"বাঃ, কি ভালো হাইট, " শ্যামলবাবু বলে উঠলেন, "আমার অবশ্য ৫'১০"। খুব কম নয় – হে হে..."

উমা এল – ওই আমাদের দরজা খুলে দিয়েছিল। শাড়িটা পাল্টেছে, সাধারন একটা তাঁতের শাড়ি, কোন প্রসাধন নেই। গলায় একটা সোনার চেন, গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। মাথায় এক ঢাল চুল, এক বেনী করা। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সেই মোটা বিনুনী....

ওহ, চশমাটা পাল্টেছে, সুন্দর একটা গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা। উমাকে বেশ সুন্দর লাগছে। কিন্তু মুখের সেই গম্ভীর, কঠিন ভাবটা আছেই। বোঝাই যাচ্ছে, পাত্রপক্ষের সামনে আসতে ওর ইচ্ছে নেই।

"বাঃ, উমা তোমার চশমাটা খুব সুন্দর, " মা বললেন, "তোমাকে ভালো মানিয়েছে। কিন্তু ছবিতে তো তোমার চশমা ছিল না? তুমিও তো বেশ লম্বা। তোমার হাইট কত?"

"আমার হাইট ৫'৬"..." উমা বলল, "হ্যাঁ, ছবিটা বাবা বিয়ের জন্য জোর করে তুলিয়ে ছিল, চশমা থাকলে নাকি ছেলেরা পছন্দ করবে না..."

"খালি অবান্তর কথা..." মহিলা বলে উঠলেন, "দিদি, আমার উমা খুব ভাল রান্না করে আর খুবই ভালো গিটার বাজায়..."

মা বললেন, "হ্যাঁ, চিঠিতে লেখা ছিল তুমি ভালো গিটার বাজাও – তা, আমাদের একটু শোনাও..."

উমা বলল, "না, প্লিজ – আমি গিটার বাজানো ছেড়ে দিয়েছি..."

মহিলা বললেন, "ওরা বলছেন যখন, একটু বাজাও না – একটা গান বাজাও..."

"প্লিজ, আমাকে অনুরোধ করো না, " উমা বলল, "আমি অনেক দিন বাজাই না। গিটারের তার টার হয়তো ছিঁড়ে গেছে..."

মহিলা আর কি করবেন, মাকে বললেন, "চলুন দিদি, আমার বাড়িটা একটু ঘুরে দেখবেন..."

মা বললেন, "চলুন, কিন্তু উমার গিটার শোনার আমার খুব ইচ্ছে ছিল..."

মা, মহিলা আর তাঁর বড়ো মেয়ে রুমাদি বাড়ি ঘুরে দেখতে গেলেন।

মা গিটার শুনতে চাইছেন, ভাবলাম, এই গম্ভীর, কঠোর মেয়েটিকে একটু অনুরোধ করে দেখি।

"উমা, প্লিজ, একবার বাজান, " আমি বললাম, "আমার মা খুব ভালো গাইতেন, সংসারের চাপে গান আর হয়নি। কিন্তু ছেলের বউ ভালো গান জানবে, সঙ্গীত ভালবাসবে, এটা তাঁর খুবই ইচ্ছে। মা খুব খুশি হবেন। আমারো খুব ইচ্ছে করছে আপনার গিটার শোনার, আমিও একটু আধটু গান শিখি, বুঝি। আপনি প্লিজ, বাজান..."

মায়া আর শ্যামলদা(জামাই)মিলেও উমাকে অনুরোধ করে যেতে লাগলো – কিন্তু উমা মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল।

আমার সমস্ত আবেগ, ইচ্ছেশক্তি দিয়ে আমি ওকে অনুরোধ করে যেতে থাকলাম।

কিছুক্ষন পর উমা বলল, "ঠিক আছে, আর বলবেন না, প্লিজ। আসলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এভাবে, এই রকম পরিস্থিতিতে আর গিটার বাজাবো না, তাই ইচ্ছে করছিল না। মায়া, গীটারটা নিয়ে আয়..."

মায়া হাসিমুখে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর চলে গেল, শ্যামলদা হা হা করে হেসে উঠলেন – বরফ গলে গেল।

মায়া গিটারের বাক্স নিয়ে এল। উমা গিটারটা বার করল, পরম মমতায় একটা ব্রাশ আর নরম কাপড় দিয়ে মুছে নিলো, তার গুলো পরীক্ষা করলো, টুং টাং করতে করতে তারগুলো সুরে ঠিক করে বেঁধে নিলো। ওর মুখ চোখ একদম পালটে গেল – সেই কঠোরতা আর নেই। এ যেন অন্য এক মেয়ে। গিটারে কিছু কঠিন সরগম, তান বাজাতে থাকল - কি সুর, কি শ্রুতি। বুঝলাম, ও খুবই উচ্চমানের শিল্পী।

"বলুন, " উমা মৃদু হেসে বলল, "কি গান শুনবেন?"

আমি বললাম, "যা আপনার ভালো লাগে। আমি যে গান বলব, সেটাই বাজাতে পারবেন?"

উমা একটু হেসে বলল, “চেষ্টা করতে পারি...”

“ও গিটারে এক্সপার্ট, “ শ্যামলদা বললেন, “রেডিওতে, টিভিতে বাজায়, শোনোনি?”

আমি বললাম, “একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজা্ন – আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না...”

এটা একটা টপ্পা অঙ্গের গান, অনেক মীড়ের কাজ আছে। এটা সঠিকভাবে বাজাতে ঘাম ছুটে যাবে এই দাম্ভিক মেয়ের।

উমা শুরু করল, কি সুন্দরীই না হয়ে উঠল এই রাগী মুখের মেয়েটা। মুখে একটা কোমল, পবিত্র, সমাহিত ভাব – একমনে বাজিয়ে চলেছে।

আর বাজনা? আমি ছোটবেলা থেকে গান শিখছি, একসময় কাজী অনিরুদ্ধ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বটুক নন্দী – এদের গিটার খুব শুনতাম, সেই আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কি নিখুঁতভাবে উমা এক একটা টপ্পার দানা, মীড় বাজিয়ে চলেছে – অবাক হয়ে গেলাম।

গান শেষ হল।

“অপূর্ব, আমি এরকম গিটার আগে শুনিনি,“ আমি বলে উঠলাম, “এই কঠিন গানটা আপনি পারবেন, তাও এতো ভালো ভাবে – আমি ভাবতেই পারিনি। আমাকে গিটার বাজানো শেখাবে্ন?”

ও খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল, “থ্যাংকস, তাও তো কতদিন পর বাজালাম। শেখানোর ব্যাপার পরে দেখা যাবে...”

ও খুব খুশী হয়েছে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রানবন্ত একটা মেয়ে। এতক্ষন মুখ চোখ কঠিন, গম্ভীর করে রেখে নিজেকে একটা খোলশের আড়ালে রেখেছিল।

গিটারের আওয়াজ শুনে মা চলে এলেন, উমা একটা নজরুলগীতি বাজালো।

মা খুব খুশী হলেন, বললেন, “আরও একটা গান বাজাও...”

উমা আরেকটা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজালো।

মা একমুখ হেসে বললেন, “বাঃ, মন ভরে গেল উমা, তোমার গিটার শুনে...“

উমাও একমুখ হাসি নিয়ে মাকে প্রণাম করল।

আসর শেষ হল। মায়া গিটার বাক্সবন্দি করে নিয়ে গেল।

আমাদের প্রচুর খাবার দেওয়া হল। আমরা কিছু খেলাম, চা খেলাম – টুকটাক কথা চলতে লাগলো। সবাই খুব খুশী। উমাও খুব খুশি। মুখে হাসি লেগেই আছে। মাঝে মাঝেই চোরা দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখে নিচ্ছে। মার উমাকে খুবই ভালো লেগেছে – ওর সঙ্গে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন।

একটু পর উমা অন্য আর একটা চশমা পরে এলো।

মা বলে উঠলেন, “বাব্বা, তোমার ক’টা চশমা?”

উমা বলল, “আমার তিনটে চশমা, আমি একসঙ্গে সব সময় তিনটেই বানাই...”

মা বললেন, “কেন? এতগুলো চশমা তোমার কেন লাগে?”

আমি দেখলাম, উমার মা, শ্যামলদা, রুমাদি – সবাই উমাকে ইশারায় চুপ করতে বলছেন। কিন্তু উমা কোন কথা শোনার মেয়েই নয়।

উমা বলল, “আমার তো মাইয়োপিয়া আছে। -৬ আর -৭, দুই চোখের পাওয়ার। সিলিন্ড্রিকাল, বাইফোকাল – কমপ্লেক্স। কেন, বাবা আপনাদের চিঠিতে জানান নি?”

“না, আমরা জানিনা তো, “ মা বললেন, “যাক গে, তবে, এতোগুলো চশমা কেন লাগবে?”

উমা বলল, "যদি একটা চশমা ভেঙ্গে যায়, আরো দুটো থাকবে। যদি দুটো চশমা একসঙ্গে ভেঙ্গে যায়, একটা থাকবে – ভাঙ্গা চশমা সারিয়ে নেওয়ার সময় পাওয়া যাবে। তাই সাবধানতা হিসেবে একসঙ্গে তিনটে চশমা বানাই। চশমা ছাড়া আমি তো অন্ধ..."

মা বললেন, "তার মানে? চশমা ছাড়া তুমি কোন কাজ করতে পারবে না?"

উমা ম্লান হেসে বলল, "হে হে, কাজ? আমি তো কিছুই দেখতে পাবো না। এই যে আপনি আমার পাশে বসে আছেন, আপনাকেই আমি দেখতে পাবো না। একজন এখানে বসে আছেন এটাই শুধু বুঝতে পারব..."

২

আমার মায়ের মুখ কালো হয়ে গেল। মা খুব নরম মনের মানুষ। আমি জানি, মা কথাগুলো শুনে কতখানি আঘাত পেলেন। উমা এত সুন্দরী, এত ভালো গিটার বাজায় - মার ওকে খুবই পছন্দ হয়েছিল। মা চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন।

ঘরের সবাই আমাকে আর মাকে দেখছিল। স্বাভাবিকভাবেই, আমরা এবার পাত্রী রিজেক্ট করব। জেনেশুনে এই প্রায়-অন্ধ পাত্রীকে কে ঘরের বউ করবে? নেক্সট জেনারেশন --

উমার মুখ আবার ধীরে ধীরে পালটে যেতে লাগলো - আবার সেই গম্ভীর, কঠিন মুখ, সেই কুঞ্চিত ভ্রু। ও শুধু আমার অনুরোধে একটু খোলশ ছেড়ে বেরিয়েছিল। বারবার পাত্রপক্ষ দেখতে এসে মাইয়োপিয়ার জন্য রিজেক্ট করবে - তাই ও তাদের সামনে আর গিটার বাজাবেনা প্রতিজ্ঞা করেছিল। আমি বার বার অনুরোধ করে ওর প্রতিজ্ঞা ভাঙলাম।

হঠাৎ একটা প্রবল ভাবাবেগের ঢেউ এসে যেন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সারা শরীর জুড়ে, শিরায়, উপশিরায় সেই অনুভুতি বইতে লাগল। আমি শিউরে উঠলাম। এই দুঃখী, গুনী মেয়েটির জন্য আমার প্রবল স্নেহ, মায়ার উদয় হল। আমি যেন ওর পরম বন্ধু – ওকে সকল আঘাত, অপমান থেকে রক্ষা করব, আমাকে করতেই হবে, সারা জীবন ধরে। এই ভাবাবেগের নামই কি প্রেম? আমি কি উমার প্রেমে পড়ে গেলাম?

ঘরে সবাই চুপ, কেউ কোন কথা বলছেনা।

উমা বলল, "সন্ধ্যে হয়ে এসেছে – আপনারা তো অনেক দূর যাবেন..."

মা বললেন, "হ্যাঁ, আমরা এবার তাহলে আসি..."

মা আমাকে ইশারা করলেন, উমার ফটোর খামটা ব্যাগ থেকে বার করে আমাকে দিলেন, আমি ওদের ফেরত দেব। আমি খামটা ফেরত না দিয়ে পকেটে রেখে দিলাম। উমা সবই দেখছিল।

উমা বলল, "ফটোগুলো রেখে যাবেন তো, নাহলে আবার ঝামেলা করে বাই পোস্ট পাঠাতে হবে..."

আমি বললাম, "সময় হলেই ফেরত দেব..."

উমা একটু হাসলো, "হেহেহে – এখনো সময় হয়নি?"

সেই হাসিতে যে কি ছিল – ব্যথা, যন্ত্রণা, রাগ, আশা – সব কিছু ছিল।

আমি ফটো ফেরত না দেওয়াতে ঘরের সবাই একটু সহজ হলেন। এই রকমটি আগে বোধহয় হয়নি।

মা উমাকে ডাকলেন, গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন – উমাও মার পা ছুঁয়ে আবার প্রণাম করল।

আমরা রাস্তায় এলাম, সঙ্গে শ্যামলদা।

শ্যামলদা বললেন, “রজত, একটা কিছু বলে যাও, কি ঠিক করলে তোমরা?”

“আমি টেলিফোন করব”, শ্যামলদাকে বললাম, “বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে”।

একটা ট্যাক্সি দাঁড় করালাম, শ্যামলদা দাঁড়িয়ে রইলেন, আমরা চলে গেলাম।

টাক্সিতে দেখি, মা নিঃশব্দে কাঁদছেন –

বললাম, “মা, কেঁদোনা, আমি খোঁজ নিচ্ছি, একটু সময় লাগবে। সব ঠিক হয়ে যাবে, ভেবোনা...”

মা বললেন, “কি কপাল দ্যাখ মেয়েটার, এত গুনী, সুন্দরী – অথচ...”

বাড়ি ফিরে বাবাকে সব বললাম।

আমি কয়েকজন চক্ষু বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বললাম। কেউই আমাকে খুব একটা আশার কথা শোনালেন না। একজন বললেন, চেন্নাইয়ের ডাঃ এস.এস.কেদারনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, উনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

আমি ঠিকানা জোগাড় করে ডাঃ কেদারনাথকে সব গুছিয়ে লিখলাম। এই রোগ সারানো যায় কিনা, বংশগত কিনা, কি কাগজপত্র লাগবে, কবে ওর সঙ্গে দেখা করা যাবে – এই সব জানতে চাইলাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ডাঃ কেদারনাথ নিজের পার্সোনাল প্যাডে আমার চিঠির উত্তর দিলেন। আমি আজও সেই চিঠি রেখে দিয়েছি।

Dear Mr Sen,

You may come here with the patient any time, convenient to you, no need for any papers.

HEREDITY does not cause myopia as many people believe. If myopia is inherited, we would not have seen the tremendous increase in myopia that has occurred in recent decades. Genetically determined changes do not occur so rapidly.

There are other factors that could affect the possible development of myopia in an individual.

Very soon, Laser Intrastromal Keratomileusis (LASIK) will be introduced here. It is very popular worldwide and capable of correcting a wide range of nearsightedness (myopia), farsightedness (hyperopia) and astigmatism.

Go ahead, marry your Girl friend. May God bless you.

Yours Sincerely,

Sengamedu Srinivasa Kedarnath

চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হলো, একটা বড় পাথর যেন বুকের উপর থেকে নেমে গেল।

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন – সবাই সব কিছু শুনে এই পাত্রীকে খুবই অপছন্দ করেছিল। কিন্তু বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে উমাকে মার (আমারও) খুবই পছন্দ হয়েছে। তাই বাবা বলেছিলেন যে আমি যা ভালো বুঝব তাই যেন করি।

সব খোঁজখবর নিতে প্রায় দু’মাস কেটে গেছে। মাঝে মাঝে ওদের সংক্ষেপে টেলিফোনে জানাতাম, কি করছি না করছি।

যাই হোক, এক শনিবার আবার ওদের বাড়ির কলিং বেল টিপলাম।

উমাই দরজা খুলল, সেই রাগী চশমা, রাগী মুখ –

"মা আসেননি?"

"ভেতরে আসবো?"

"আসুন, আমার মা বাড়িতে নেই, আমি আর মায়া আছি..."

হলঘরে এসে বসলাম, মায়া আমাকে দেখে হাসিমুখে ছুটে এলো।

"ওঃ, রজতদা, কি ভালো লাগছে, আপনি এসেছেন..."

"সোজা অফিস থেকে আসছি, বেশ ক্ষিদে পেয়েছে..."

"নো চিন্তা, আমি এক্ষুনি খাবার নিয়ে আসছি..."

উমা বলল, "কেমন আছেন বলুন –"

ও খুব নিঃস্পৃহ থাকার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওর গলা কাঁপছিল। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে আমার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছিল।

"কেন এসেছেন? আসবেন যে, কোন খবর দেন নি ত?"

"ফটো ফেরত দিতে এসেছি..." (একটু খুনসুটির লোভ সামলাতে পারলাম না)

"ওহ, তাহলে সময় হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ, সময় হয়েছে...."

মায়া খাবার নিয়ে এল, এক প্লেট ধূমায়িত চাউ মিন, আমি সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া শুরু করে দিলাম।

উমা বলল, "খাওয়ার আগে হাত ধুতে হয়, জানতাম..."

আমি বললাম, "চামচ দিয়ে খেলে হাত ধুতে হয় না..."

মায়া বলল, "কিসের সময় হয়েছে, দিদি?"

উমা বলল, "রজতবাবু ফটো ফেরত দিতে এসেছেন..."

"ওহ, রজতদা, " মায়া বললো, "আমরা কিন্তু খুব আশা করেছিলাম..."

মায়ার চোখ জলে ভরে গেল, কিন্তু উমার কোন বিকার নেই। ও সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে যেন আমার মনের কথা পড়ে ফেলতে চাইল। এবং কি আশ্চর্য, ও আমার মন বুঝেও ফেলল।

উমা বলল, "রসিকতা রাখুন, খুবই টেনশনে আছি। ডাক্তাররা কি বলল, বলুন?"

খাওয়া শেষ করে বেসিনে হাত, মুখ ধুয়ে এসে বসলাম। এখন সব খুলে বলতে হবে।

"উমা, আমি খুব ক্লান্ত," আমি বলতে থাকলাম, "এই দু'মাস খুব ছুটোছুটি করতে হয়েছে"

আমি বলে যেতে থাকলাম, একটার পর একটা ডাক্তারের কথা, তাদের পরামর্শ। শেষে ডাঃ কেদারনাথের কথা, তাঁর মতামত – দুই বোন চোখ বড় বড় করে আমার কথা শুনে যেতে লাগল।

আমি ফটোর খামটা ব্যাগ থেকে বার করে উমাকে দিলাম, বললাম, "খুলে দেখুন –"

খামটা খুলতেই ডাঃ কেদারনাথের চিঠিটা বেরিয়ে এল। উমা অবাক হয়ে গেল, চিঠিটা পড়তে থাকল। মায়াও এসে চিঠিটা পড়ল – দুই বোন কাঁদতে শুরু করল। উমা বার বার চিঠিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল।

আমি বললাম, "ডাক্তাররা যাই বলুক, বাবা, মা আর আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমায় বিয়ে করবে, উমা?"

মায়া আনন্দে কেঁদে ফেলল, উমা আক্ষরিক অর্থেই কেঁপে উঠল, চোখ জলে ভরে গেল, চশমা খুলে কাঁচগুলো বারবার আঁচল দিয়ে মুছতে থাকল।

আমি আবার বললাম, "ওহ, সরি উমা, তোমাকে তুমি করে বলে ফেললাম। আমাকে ফিরিয়ে দিও না প্লিজ, আমি তোমাকে, আমি তোমাকে – ঠিক আছে। আমায় গিটার শেখাবে? সারা জীবন ধরে আমি তোমার কাছে গিটার শিখব, তোমার গিটার শুনবো, আমাকে শেখাবে তুমি, টিচার?"

উমার মুখ পাল্টাতে লাগলো, সব কাঠিন্য চলে গেল, একটা কোমল, সুন্দর, মায়াভরা মুখ নিয়ে ও আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। ধীরে ধীরে সেই মুখ বেঁকে চুরে ভেঙ্গে যেতে লাগলো, ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। দীর্ঘদিনের জমানো কষ্ট, অপমান যেন দুর্বার গতিতে বেরিয়ে এল।

মায়া কান্নাভেজা গলায় বলল, "রজতদা, আপনি – আপনি অসাধারন মানুষ। দিদির শিবরাত্রির উপোষ করা সার্থক হয়েছে। ডাঃ কেদারনাথের এই চিঠিটা দিয়ে আপনি দিদির সব দুঃখ, ভয় ভুলিয়ে দিলেন..."

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "আমার জবাব কিন্তু এখনো পেলাম না – আমাকে শেখাবে তো, উমা?"

মায়াও হাসল, বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ শেখাবে। ওঃ, আপনি বোঝেন না কেন? ও তো আপনাকে প্রথম দিনেই শেখাতে চাইছিল..."

আমি বললাম, "ও তো কিছুই বলছে না। উমা, প্লিজ বলো, আমায় গিটার শেখাবে তো?"

উমা কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে বলল, "উফফ – হ্যাঁ, শেখাবো, শেখাবো, শেখাবো।"

এর দু'মাস পরে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

একটিই মেয়ে আমাদের, বড়ো হয়ে গেছে। আগামীবার মাধ্যমিক দেবে – চশমা পরে না, হে হে।

উমা শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, কন্যা নিয়ে চুটিয়ে সংসার করছে, টিভিতে প্রায়ই প্রোগ্রাম করে, কিছু ডিভিডি ও বাজারে বেরিয়েছে –

তবে, গিটার আর আমার শেখা হল না। গিটার শেখার থেকে গিটারবাদিকার দিকেই যে আমার বেশী ঝোঁক।

প্রবন্ধ

সেই দিন এই দিন

গগন হরকরা

চোখ ছল ছল করে,

ওগো মা......

কি ব্যাথা অন্তরে,

ওগো মা......

ভাঙ্গনের যে খেলা চারিধার,

নেই গান আজ একতার।।

চোখ ছল ছল করে,

ওগো মা.......

ভূপেনদার এই গানটা বোধ করি আজ বড় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে আমাদের চিন্তার সব মূল জুড়ে।আর তাই প্লাস্টিক অনুভূতির রুধিধারী মানস পটে যখন প্রশ্ন করি নিজেকে তখন উত্তর আসে- ভীরু হতে পারি।কিন্তু এতটা না যতটা আপনি মনে করেন।আসলেই কি তাই?ভাবতে অবাক লাগে যখন শুনি ঔপনিবেশবাদির ধ্বজাধারী ব্রিটিশ ফিরিঙ্গিরা আমাদের ২০০ বছরের বলৎকারের ষোলকলা পূর্ণ করেছিল সুকৌশলে শোষন মুক্তির উপহার হিসাবে দুই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের বিষবাষ্প আমাদের সংকীর্ন মানস পটে উস্কে দেয়ার মধ্য দিয়ে।আফসোস আমরা তখনও দিধান্বিত ছিলাম!তারপরও আমাদের ঘোর কাটেনি।পেলাম পাক সার জমিন।আর হারালাম চিরায়ত সংস্কৃতির সরোবর বাঙ্গালীর দলিল।সেবারও কালিনী ফণা তুলেছিল,বিষ বাষ্পে রুদ্ধ করেছিল বাংলার আকাশ,উস্কে দিয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের উন্মাদনা,সংখ্যালঘু বধের পৌরুষ চেতনা।আফসোস আমরা তখনও দ্বিধান্বিত ছিলাম!!অতঃপর ইন্দ্রপতন।সময় ৭১, পূর্ব পুরুষের ঋণ শোধিবার।এ জাতি ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবেনি এ দায় কখনও এভাবে মিটাতে হবে।আমাদের মিটাতে হল,৩০লক্ষ ফুলের বিনিময়ে।হ্যাঁ,৩০ লক্ষ ফুল যারা হারিয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতা ফুটাবে বলে।আফসোস আমরা আজও দ্বিধান্বিত! আর তাই আজও শুনতে হয় জনৈক গনিকাদের মুখে লাখো শহীদের গৌরবত্ব ম্লানকারী নব নব সংখ্যাতত্ব,শিব কুমারদের বোবা চোখ খুঁজে ফেরে ছিন্নভিন্ন লাল সবুজের খন্ড।তবুও আমরা কতক অনড় দ্বিখন্ড!আবার পোড়ে ঘর,পোড়ে দেবালয়-জনপদ।তবু টিভি স্ক্রলিংয়ে উঠে আসেনা পোড়া বিবেকের মুখ।চাপা পড়ে জীবন্ত মানবতা TVC আর আধুনিক পুঁজির Values-এ।

আর তাই পিক সিগারদের আজও গেয়ে ফেরতে সেই হারানো ফুলের খোঁজ-

"Where have all the flowers gone.....Long time passing........"

প্রথমত একটি ব্যপার স্পষ্ট হওয়া উচিত বলে মনে করি যে যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে এইসব ঘৃনিত মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে জাতির কলঙ্ক মোচনের যে দাবি বিগত চার দশক ধরে এক প্রকার অপমানিত হয়ে আসছিল তার একমাত্র কারন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দাবির সুপরিকল্পিত রাজনীতিকরন।যে দেশে রাজনীতিরই রাজনীতিকরনের মত পুঁজিকরণ ঘটে সেখানে এরকমটিইতো কাম্য! অথচ এই রকম একটা গণ দাবী বাস্তবায়নের মহৎ উদ্যোগ নেয়ার কথা ছিল খোদ রাষ্ট্রের। কিন্তু আমরা তা পারিনি। কেননা আমরা আজ পর্যন্ত কোনো জাতীয় সরকার গঠন করতে পারিনি, গঠন করেছি দলীয় সরকারের! আর তাই আইন,বিচার ও প্রশাসনের মত জাতীয় গুরুত্তপূর্ণ স্তম্ভগুলোর মত জাতীয় দাবিগুলোও আজ দলীয়। শুধু তাই নয়, দলীয় হয়েছে জাতীয় চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের মত জাতীয় গৌরব, এমনকি আমাদের কতিপয় মুক্তিযোদ্ধারাও। বাদ যায়নি সার্বভৌম জাতীয়তা,ধর্ম,বর্ণ,এমনকি চেহারাও। আর তা নাহলে আজ স্বাধীনতার এই চার দশকেরও অধিক সময় পেরিয়ে গেলেও কেন পাহাড় কেঁদে বেড়ায় কল্পনা চাকমাদের খোঁজে, কেনই-বা দেখতে হয় কেবল তিন শব্দের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্যের। আবারও বলি সমস্যাটা পুঁজিবাদী রাজনীতিভূক ব্যবসায়ীদের। আর তা নাহলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে নব গঠিত ট্রাইব্যুনালের ৭৩ পরবর্তী সংশোধিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিচার পরবর্তী সম্ভাব্য সকল জটিলতা এড়াতে কেন আগে থেকেই ট্রাইব্যুনাল আইন খতিয়ে দেখা হলনা তা আমার বোধগম্য নয়। আমাদের সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকেরা এতটা উদাসীন আমি তা মনে করিনা। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারপতি নিজামুল হক কে নিয়ে সৃষ্ট স্কাইপে জটিলতার পর দ্রুত সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। কেন তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু যা জানিনা তাহলো কেন আগে নয়? কেন আগে থেকে এইসব জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমাদের পরিশ্রমের অর্থ ব্যয় করে উনারা ব্যর্থ হন, কেন এইরকম একটা বিচার প্রক্রিয়ার আঁতুর ঘরেই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে আমরা লজ্জিত হই? কীভাবেই বা বাচ্চু রাজাকাররা পালিয়ে যায়? আর কাদের মোল্লার এমন রায় আসে,যেখানে ৬টি মামলার ৫টিই প্রমানিত হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় ঐ ৫টি মামালায় অভিযোগকৃত সকল হত্যাকান্ডই মহামান্য ট্রাইব্যুনালের কাছে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত! সত্যিই বলতে হয়-হায়! সেলুকাস...কি অপার বিস্ময়!......দেখাইলে জাতিময়......!!

শুধু এখানেই শেষ নয়। প্রধান বিরোধী দল যারা কিনা এইসব স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মভূকদের (জামায়াত,শিবির) সেই পঁচাত্তর পরবর্তী Indemnity প্রদানের মাধ্যমে যে Commitment দিয়েছিলেন তারই অঙ্গীকার পূরনের দায় জলন্ত বাসের চালকের দেহ ভস্ম দিয়ে মিটাচ্ছেন আজ অবধি।আজ জাতীয় ঐক্যের এই সর্বোচ্চ নিবেদনে উনাদের এই আত্মস্বীকৃত রাষ্ট্রদ্রোহীতার সাথে যে ইতিহাস কার্পন্য করবেনা তা বলা বাহুল্যই। ৮৭ এর গণ আন্দোলনের শহীদ নূর হোসেন বেঁচে থাকলে আজ এই ফাল্গুনের জনস্রোতে আসতেন কিনা তা জানিনা। কেননা তিনি ক্ষমতাসীন সরকারী জোটে যখন এক কালের জলপাই পোষাকধারী স্টিম রোলার,ভোটের সংখ্যাতত্বে জাতীয় স্বত্তার ধর্মীয়করনের জনককে সময়ের পালা বদলে ক্ষমতায় আসীন দেখতেন, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিতেন। সম্প্রতি আমরা আরেকবার অপমানিত হলাম; অর্থমন্ত্রী শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মানাধীন ভাস্কর্য স্থাপনে বিরোধীতাকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন! উল্লেখ্য বিগত নবম সংসদ নির্বাচনে উনারা সাময়িক সময়ের জন্য এই খেলাফতে মজলিসের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছিলেন! যেমনটি করেছে বিএনপি মৌলবাদীদের সাথে। একে উনারা গণতান্ত্রিক রাজনীতির কৌশল কিংবা যাই বলুন, দায় নিতে হবে সবাইকে। ইতিহাসে যেমনটি নিয়েছিল মুসলীম লীগ,পাকিস্তান পিপলস পার্টি। আর তাই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস আমাদেরই হাতে ফিরিয়ে দিতে

হবে। যুদ্ধোপরাধীদের বিচারের মত একটি ঐতিহাসিক জাতীয় পদক্ষেপে কেন প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল একমত হতে পারলনা তার জবাব দেয়ার সময় মনে হয় আর বেশী দেরি নয়।

ইতিহাস কথা কয়। ৪৭, ৫২ ও ৬৯ এর দায় আমরা মিটিয়েছি ৭১-এ, প্রয়োজনে আবার মেটাব ২০১৩এ। কেননা প্লাস্টিক স্নায়ুর যে অপবাদ নতুন প্রজন্ম বয়ে বেড়াচ্ছিল, তা প্রমানে আমাদের ৮টি দিনও লাগেনি।।

যদি

শঙ্কু

পড়াশোনা করে মানুষ হওয়াটা যদি হয়ে যায় ঘোরতর অন্যায়, অপরাধ, অসামাজিক? আর অসামাজিক কার্যকলাপ যদি হয়ে যায় আদর্শ? তাহলে কি হয়? দেখাই যাক...

দৃশ্য ১

সকালবেলা বাবা ঘুম থেকে উঠে মাকে বলছেন, 'তা হ্যাঁগো, ওর বন্দুকের গুলিগুলো কোথায়? রোজ রোজ তো কিনে দিতে পারবো না। ব্ল্যাকে অতি কষ্টে জোগাড় করা। হারিয়ে গেলে গায়ে লাগে, বুঝলে?

মা বললেন, 'আর কেনই বা কেনা? ওতো ঠিক করে চালাতেই পারে না। এ ছেলের জন্যে পাশের বাড়ীর বৌদির কাছে মুখ দেখানো দায় হয়েছে। ... ওদের ছেলে, তিনবার জেলখাটা হয়ে গেছে, একবার ডাকাতির কেস, দু'বার রাহাজানি। ...হ্যাঁগো, আমাদের ছেলের নাম কি কোনোদিন ওয়ান্টেডের লিস্টে দেখতে পাবো না? একটা কেসেও ফাঁসবে না?

—'কেঁদো না কেঁদো না,...সবই আমাদের কপাল। অথচ তুমিই বল, আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি রেখেছি? এলাকার টপ সমাজবিরোধীদের কাছে টিউশন দিয়েছি, হাজার হাজার টাকা খচ্চা করেছি, কোন লাভ হয় নি ...'

—'ওকে এও বললাম, তোর যদি লাইনটা পছন্দ না হয়, না হয় লাইন চেঞ্জ করে নে। ডাকাতি রাহাজানি ছাড়া কি আর পথ নেই? তুই না হয় ছিঁচকে চোরই হ', ... কিছু না হোক টিকিট ব্ল্যাক কর। আরে তোর দাদুর পরে এ অঞ্চলে একটাও প্রতিভাবান ব্ল্যাকার হল না। শুনল না।'

—'আরে আমি তো এটাও বলেছিলাম, একটু মন দিয়ে গাঁটকাটা, পকেটকাটা যদি শিখতে পারিস, বসকে বলে তোকে বিলেতে পাঠাবো স্মাগ্লিং-এর কোর্স করতে। তাও না...'

—'ওর কি যে মাথায় পড়ার ভুত চেপেছে! সকালে দেখো, সন্ধেয় দেখো, সর্বদা বই মুখে...এইভাবে অন্ধকার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাটা নষ্ট করে গো?'

দৃশ্য ২

মা দুঃখ করে বলছেন, 'জানো, ওর খাওয়ার অভ্যেশটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে।'

বাবা চিন্তিত স্বরে বললেন, 'কার?'

—'কার আবার, তোমার গুণধর পুত্র। রোজ দু'প্যাকেট করে ইস্পেশাল বিড়ি আনি। একদমে টেনে শেষ কত্তেই পারে না!'

—'সেকি! ওর বুকে কোন কষ্ট-টষ্ট নেই তো। এই বয়সে তো ফুল দমে টানার কথা? আমি তো ওর বয়সে... তা কই ডাকো তো ওকে...।'

মা আদর করে ছেলেকে ডাকলেন, 'বাবা গোপাল, সোনা আমার, লক্ষ্মীটি, আয় বাবা একবার...। এই দ্যাখো তোমার বাবা তোমার জন্যে নতুন কল্কে নিয়ে এসেছেন। টান বাবা, সোনা ছেলে, টান একবার...।'

বাধ্য ছেলে কল্কেটা নিয়ে একটা ছোট্ট টান দিতেই কেশে-টেশে একাকার। বাবা রেগে গেলেন, 'কাশো কাশো, ভালো করে কাশো। ভালো জিনিশেই তোমার যত ন্যাকরা, না? কই, যখন ঐ ছাইপাঁশগুলো গেলো, দুধ ঘি মাখন..., তখন তো কাশি হয় না?'

—'আহা থাক। বাছাকে আমার আর বোকো না।'

—'না বকবে না! দেখো গে পাশের বাড়ীর পটলাকে। টানাটানির সংসার, বাপ দিনে মাত্র দুটো করে সিগ্রেট দেয়। তাই জ্বালিয়ে বুঝিয়ে কতো যত্ন করে দিনভর প্র্যাক্টিস করে। আর তুই হতচ্ছাড়া,... এখনও পিস্তল ধত্তে পাল্লি না। আর কবে স্টেনগান ধরবি? কবে আর আর-ডি-এক্স পাচার করবি?...'

—'আমাদের ভাগ্যে আর এসব দেখা নেই গো। এই দ্যাখো না, ওরই বন্ধু দুলু, যেমন নাম তেমনি ছেলে। সর্বদাই দুলছে... সেদিন সন্ধেবেলা শুনতে পেলাম টলতে টলতে দুলু তার মাকে বলছে, এই দ্যাখো মা আমি কেমন নেশা করেছি। আহা, কান জুড়িয়ে গেল। আমার পোড়া কপালে কি আর এ সুখ আছে?'

দৃশ্য ৩

আর একদিন। সন্ধে ছ'টা, ছেলে বাড়ীতে ঢুকলো। বাবা রাগে ফেটে পড়লেন, 'হতচ্ছাড়া, এইটে তোমার বাড়ী ফেরার সময়! বলেছি না অন্তত দু'টো কেস না করে রাত দু'টোর আগে বাড়ীতে ঢুকবি না? কোথায় গেছিলি... বল কোথায় গিছিলি?'

ছেলে মাথা হেঁট করে চুপ করে আছে। পেছনে ধরা হাত থেকে টুক করে কি একটা জিনিস মাটিতে পড়ে গেল। বাবা ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে দেখেই চোখ কপালে তুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'অ্যাঁ, কলেজের আই কার্ড! তু-তুই কলেজেও যাচ্ছিস? অ্যাঁ...ওগো, আমার প্রেশারের ওষুধটা দাও। এ ছেলের পাল্লায় পড়ে...।'

মা ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন। অতিকষ্টে বললেন, 'ওগো এই দ্যাখো, ওর আলমারি থেকে কি পেলাম! এই মোটা মোটা দু'টো বই, ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির! ওগো কি হবে গো?'

—'ওরে হতভাগা, তুই এই সব বই পড়া ধরেছিস? ওরে তোর ঠাকুমা, আমার মা, কতো সাধ করে তোর নাম রেখেছিল অপোগণ্ড, তা কি এই দিন দেখার জন্যে? ওরে...ওরে..., তোকে কতো করে বললাম না, সামনে বিগ বাউন্ডুলে কম্পিটিশন। রোজ অন্তত দু'টো করে এ-মার্কা নাইট শো দেখ। না হলে যে অডিশনেই আউট হয়ে যাবি রে মুখ্যু!... তুই বেরিয়ে যা, এই মুহূর্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা... আর তোর মুখ দেখবো না।'

ছেলে মাথা নীচু করেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

দৃশ্য ৪

ছ'মাস পর। ছেলে বাড়ী ফিরেছে। ফুল টাইট। জড়ানো গলায় চীৎকার করলে, 'অ্যাই বাপ, দজ্জা খোল... শিগগির খোল। না খুলবি তো দেবো নাকি কানের গোড়ায় অ্যাকখান...'

মা গদগদ স্বরে স্বামীকে বললেন, 'ওগো, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন গো। তোমার ছেলে আজ নেশা করেছে। আহা, আজ ছেলে আমাদের অমানুষের মতো মানুষ হয়ে ফিরেছে। বাপকে বলছে কানের গোড়ায় দেবে... আহা...!'

পুত্রগর্বে তাঁর চোখ ছলছল করেছে। পিতা কিন্তু তেমন খুশী হতে পারছেন না কেন?

স্বামীকে তাড়া দিয়ে স্ত্রী বললেন, 'অমন মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, ছেলেকে ঘরে নিয়ে এসো। আহা, আমাদের সেই ছোট্ট গোপাল, একটু কলেজের বই পড়তো বলে একদিন কতো বকাবকি করেছি। আর আজ...? আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে আনন্দে বোধহয় হার্টফেল করতেন!'

পিতা আকাশের দিকে চাইলেন। বোধহয় তাঁর স্বর্গগতা মায়ের উদ্দেশ্যে, যিনি সময়মতো হার্টফেল করেছেন...।

(সৌজন্যঃ মীরাক্কেল। পরিবর্তিত)

ফিচার

কৌতুক নকশা

শঙ্কু

কাত্তিকদা যোগাভ্যাস করাচ্ছেন। সবাইকে বসিয়ে বললেন, এবার চোখ বুজে ধ্যান করুন। যদি চোখ খুলে যায় আর কোন সুন্দরী মহিলা দেখে ফেলেন, মন চঞ্চল হতে দেবেন না। বলবেন, হরিওম।

ধ্যান চলছে। হঠাৎ একজন বললেন, হরিওম।

কাত্তিকদা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, কোথায় কোথায়?

রেজিস্ট্রি অপিসে...এক জোড়া এসেছে বিয়ে কত্তে...। রেজিস্ট্রার বললেন, এখন লাঞ্চ ব্রেক চলছে। ঘন্টাখানেক পরে আসুন।

—আরে ততক্ষণ আমরা কি করবো?

—আর একবার ভেবে দেখুন না হয়...।

এক বাচ্ছা কংকাল এসে তার বাবাকে বলল, বাবা লজেন্স খাবো। বাবা কংকাল নিজের হাতের আঙ্গুলের একটা হাড় খুলে ছেলেকে দিয়ে বলল, এই নে। ছেলে মহানন্দে তাই চুষতে চুষতে চলে গেল।

আবার খানিক পরে সে এসে বলল, বাবা, আমি ফুটবল খেলবো। তার বাবা নিজের মাথাটা খুলে দিয়ে বলল, নে যত পারিস খেল। ছেলে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

খানিকক্ষণ পরে ছেলে আবার এসে মাথাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, বাবা, পিংপং খেলবো।

তার বাবা মাথাটা পরে নিয়ে সেটা একটু চুলকে বললে, চল, দোকান থেকে কিনে দিচ্ছি।

বেচারা...

অংকের শিক্ষক রামবাবুর কিছুতেই সন্তুষ্টি হতো না। একদিন তিনি রেগে ভোলাকে বললেন, অ্যাই এটা ৯ হয়েছে? এখনও ৯ লিখতে শিখিস নি? ১-র মতো দেখাচ্ছে?

ভোলা কাঁচুমাচু মুখে বললে, স্যার, এটা ১-ই লিখেছি।

রামবাবু আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর চশমার ওপর দিয়ে কটমট করে চেয়ে বললেন, হতচ্ছাড়া, তাহলে ৯-র মতো লাগছে কেন?

মন্টুদাকে শত্তুরে বলে পেটুক। ভারী অন্যায়। কারো খাওয়া দাওয়ায় দিষ্টি দিতে নেই।

সেবার পিকনিকে মন্টুদাকে একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে প্রায় খান আশী পরোটা।

অমায়িক হেসে যে পরিবেশন করছিল, তাকে ডেকে মন্টুদা বললে, ভাই আমায় কি হাতি ঠাওরালে?

বলে গোটা তিনখানা পরোটা তুলিয়ে দিল!

ট্রেনের কামরায় দু'জন লোক সামনাসামনি বসে আছে। দ্বিতীয় জন হঠাৎ হাঁচি দিল।

প্রথম জন—ভাই, ভালো হচ্ছে না।

দ্বিতীয় জন—হাইচ্চু...

প্রথম জন (রেগে গিয়ে)—ভালো হচ্ছে না কিন্তু...

দ্বিতীয় জন—হাআআ....ই...চ্চু....

প্রথম জন (আরো রেগে গিয়ে)—বলছি না ভালো হচ্ছে না... কী শুরু করলেন এসব?

দ্বিতীয় জন—এর চেয়ে ভালো হাঁচি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়! হা-আ-আচ্চো...।

—বুঝলি পদা, আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটা সার্ভে করছি।

—কী সার্ভে?

—মেয়েরা কোন শ্যাম্পু সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে, সেটার সার্ভে।

—তারপর?

—একশ জনের মধ্যে নিরানব্বই জন একই উত্তর দিচ্ছে।

—কী উত্তর?

—হারামজাদা, বাথরুম থেকে বের হ!

বাসি খাবারের হরেক বাহার

স্বাগতা ঘোষ

১. ভাতের পুডিং : বাসি ভাত থাকলে ১ কাপ বাসি ভাত, ৩টে ডিম, চিনি আন্দাজ মতো, একটু ভ্যানিলা এসেন্স, ১/৪ কাপ ঘন দুধ, ১/২ চা-চামচ জায়ফল গুঁড়ো – সব একসাথে মিক্সারে ভাল করে মিশিয়ে নাও। আভেন সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় ১০ মিনিট গরম করে নাও, এবার একটা আভেনপ্রুফ বাটিতে পুডিংটা ঢেলে ১০-১৫ মিনিট বেক করে নাও, যতক্ষন না পুডিং জমে যাচ্ছে ও ওপরটা লালচে হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হলে কাজু-কিশমিশ ছড়িয়ে দাও।

২. স্যান্ডুইচ: বাসি তরকারী, যেমন আলু-পেঁয়াজের তরকারী, মাংসের ঝোল-আলু বা নিরামিশ তরকারী (তেতো না হলেই ভাল) অনেক সময় ফ্রিজে পরে থাকে। সেই তরকারী একটু কড়াইতে নেড়ে শুকিয়ে নাও। এবার একটু ঠাণ্ডা করে ওতে কোরানো চীজ, চিলি সস্ ভাল করে মেখে শশা, টমেটোর চাকা দিয়ে সাজিয়ে স্যান্ডুইচ বানিয়ে গ্রীল করে নাও। এবার ছোট ছোট টুকরো করে কেটে গরম চায়ের সাথে পরিবেশন কর। বেশ ভাল লাগবে।

৩. এগ ফ্রায়েড রাইস : কড়াইতে তেল গরম করে একটু নুন দিয়ে ডিম ফেটিয়ে ভেজে আলাদা করে তুলে নাও। ওই কড়াইতেই রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি আলাদা আলাদা করে ভেজে নাও, সামান্য চিনি দাও, আজিনা মোটো, নুন, সাদা মরিচের গুঁড়ো দাও। ভাল করে নেড়ে বাসি ভাত দাও। আবার ২-৩ মিনিট ভাল করে নেড়ে ডিমের ঝুরিটা দিয়ে আবার ভাল করে নেড়ে ওপর থেকে পেঁয়াজ শাক কুচি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন কর।

৪. পাউরুটির চাট: বাসি পাউরুটি বেশ ভাল করে টোস্ট করে নাও, এবার ভাল করে পাউরুটির ওপর মাখন মাখিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নাও। একটা প্লেটের ওপর পাউরুটির টুকরো গুলো সাজিয়ে নাও, এবার এর ওপর গোল গোল করে আলু সেদ্ধর চাকা বা কুচি দাও, চাট মশলা ছড়িয়ে দাও। ধনে পাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি ছড়িয়ে দাও। ইচ্ছে হলে একটু পাতিলেবুর রস দাও বা তেঁতুলের চাটনি দাও। এবার একদম ওপরে ঝুরিভাজা ছড়িয়ে দাও।

৫. পাউরুটির পিৎজা : স্লাইস পাউরুটি ভাল করে টোস্ট করে নাও, তার ওপর ভাল করে টমেটো সস্ লাগাও। এর ওপর সেদ্ধ করা চিকেনের টুকরো, অলিভ, টমেটো কুচি ও সামান্য নুন ছড়িয়ে দাও। মাশরুম দিতে চাইলে আগে একটু ভেজে নেবে। এবার এর ওপর ওরিগ্যানো, শুকনো লঙ্কা কুচি ও ভাল করে মোৎজারেলা চীজ কোরানো ছড়িয়ে দাও। তারপর একটু অলিভ অয়েল ছড়িয়ে বেক করে নাও, যতক্ষন না চীজ লালচে হয়ে যাচ্ছে।

৬. ব্রেড পুডিং : বাসি পাউরুটি থাকলে তার চারধারের খয়েরী অংশ বাদ দিয়ে ভাল করে দুধ দিয়ে মেখে নাও। এবার এর মধ্যে আরো খানিকটা দুধ, চিনি, মাখন, ডিম, ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে ভাল করে মিক্সার বা বীটারে সব এক সাথে ভাল করে ফেটিয়ে একটা ঘন গোলা বানাও। এবার আভেন প্রী-হীট করে এই মিশ্রন বেক করতে দাও, যতক্ষন না ওপরটা লালচে হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে কাজু বা কিশমিশও দেওয়া যায়।

৭. ফ্রুট স্যালাড : বাড়ীতে অনেক সময়েই ফল পড়ে থাকে, খাওয়া হয় না; যেমন – আঙ্গুর, আপেল, কলা, আম – বেশী দিন পড়ে থাকতে থাকতে খারাপ হয়ে যায়। এরকম নানান রকম ফল ছোট ছোট করে কেটে নাও। ন্যাসপাতি, আপেল বা শক্ত ফল থাকলে চিনি দিয়ে ১০ মিনিট ফুটিয়ে নাও, এতে ফল নরম ও মিষ্টি হয়ে যাবে। চিনির রস ঝরিয়ে সব ফল আলাদা করে রেখে দাও। এবার ভ্যানিলা আইসক্রীম বা মিল্ক মেইড ও ক্রীমের মিশ্রনে এই কাটা ফল গুলো মিশিয়ে নাও। ওপরে একটা চেরী দিয়ে সাজিয়ে দাও।

৮. লুচির পায়েস : দুধ ঘন করে নাও, এবার এর মধ্যে চিনি ও ছোট বা বড়ো এলচের গুঁড়ো মিশিয়ে নাও। ঢিমে আঁচে দুধ গরম রাখ। এবার বাসি লুচি থাকলে সেগুলো ছোট ছোট করে কেটে দুধে দিয়ে আরো ১০ মিনিট ঢিমে আঁচে ফুটিয়ে নাও। এটা পুরনো দিনের হারিয়ে যাওয়া রান্না।

৯. কাবাবের তরকারী : বাসি কাবাব থাকলে সেগুলো টুকরো করে নাও। ছোট টুকরো হলে আর কাটার দরকার নেই। এবার কড়াইতে তেল গরম করে তাত আদা-রসুন বাটা ভেজে কুচনো পেঁয়াজ লাল করে ভেজে নাও। একটু চিনি, হলুদ, শুকনো লংকার গুঁড়ো দিয়ে কষে নিয়ে একটু টমেটো কুচি, নুন ও সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে মাঝারি আঁচে আরেক বার কষে নাও, যাতে টমেটো গলে যায়। এবার খানিকটা ফেটান দই, একটু কাজু ও পোস্ত বাটা দিয়ে নেড়ে নাও। যখন ফুটে উঠবে, তখন

কাবাব গুলো দিয়ে চাপা দিয়ে ৮-১০ মিনিট ঢিমে আঁচে রান্না করে নাও। নামাবার আগে ঝোল বেশী হয়ে গেলে ফুটিয়ে একটু ঘন করে নাও এবং ওপর থেকে একটু ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে দাও। রুটির সাথে বেশ ভাল লাগবে।

১০. রুটির রোল : বাসি রুটি থাকলে তা একটু চাটুতে গরম করে মাখন মাখিয়ে নাও। এতে রুটি বেশ নরম থাকবে। এবার এর মধ্যে নুন-আদা বাটা দিয়ে সেদ্ধ চিকেন ও সব্জী চীজ বা মেয়োনেইজ, সাদা মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মেখে রোল করে খাওয়া যায়। নুন-আদা বাটা দিয়ে সেদ্ধ চিকেন সেদ্ধ করার সময় অল্প জলে সেদ্ধ করে জল একদম শুকিয়ে ফেলতে হবে। আলু সেদ্ধ, মাখন, চীজ বা সসেজ, মেয়োনেইজ, মাস্টার্ড সস্ ইত্যাদি দিয়েও রোল বানানো যায়।

১১. স্ন্যাক্স: বাসি স্লাইস পাউরুটি থাকলে তার ধার গুলি কেটে নিয়ে সামান্য জলের ছিটে দিয়ে নরম করে বেলে নাও। এবার একটা পাত্রের মধ্যে নুন-আদা-রসুন বাটা দিয়ে সেদ্ধ চিকেন ছোট ছোট করে কুচিয়ে দাও, মিহি করে কুচি করা সামান্য পেঁয়াজ, মিহি করে কুচি করা সামান্য গাজরো ক্যাপসিকাম দাও, কোরানো চীজ দাও; ম্যাগি চিকেন কিউব থাকলে গুঁড়ো করে মিশিয়ে দাও, একটু সাদা মরিচের গুঁড়ো দাও - সব একসাথে ভাল করে মেখে পাউরুটির মধ্যে দিয়ে পাউরুটির চারধার একটু জম লাগিয়ে ভাল করে এঁটে দাও, যাতে খুলে না যায়। এবার ১০-১৫ মিনিট ফ্রিজে রেখে পুরভরা পাউরুটি গুলো ডিমের গোলায় ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ঢিমে আঁচে ভেজে নাও। সসের সাথে গরম গরম পরিবেশন কর।

১২. অড্ডুতুরে জ্যাম : বাসি চাটনি থাকলে তা একটু লেবুর রস দিয়ে ফুটিয়ে শুকিয়ে নাও। এবার ঠাণ্ডা করে মিক্সারে ভাল করে পিষে রেখে দাও। বাড়ীতে জ্যাম না থাকলে এটা ভাল স্টেপনির কাজ করে।

টুকিটাকি:

১. বাড়ীতে পিঁপড়ে হলে ভিনিগারের জলে রোজ ঘর মুছলে পিঁপড়ে থাকবে না।

২. টুথপেস্ট দিয়ে গয়না পরিষ্কার করলে, নতুনের মত চকচকে থাকবে।

৩. কয়েক টুকরো কর্পূর আধ কাপ জলে বিছানার নিচে রেখে দিলে মশা আসবে না।

৪. এনামেলের বাসন থেকে দাগ তুলতে নুন ও ভিনিগারের মিশ্রন খুব কার্যকরী।

৫. বিস্কুটের কৌটে কিছু ব্লটিং পেপার রেখে দিলে বিস্কুট মুচমুচে থাকবে।

৬. তরকারীতে কাঁচা লঙ্কার সুগন্ধ আনতে বাটা লঙ্কার সাথে ক'টা আস্ত লঙ্কা ভেঙ্গে দিতে হবে।

৭. পোড়া বাসন সারারাত নুন জলে ভিজিয়ে রাখলে মাজতে সুবিধে হয়।

৮. বাগানে বা টবে গাছ করলে সপ্তাহে ১ দিন ভাইটামিন ক্যাপসুল খুলে ওষুধের পাউডার গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে দিলে গাছ ভাল হয়, ফুল বড় হয়।

৯. ডিমের খোলার গুঁড়ো, চা-পাতা গুঁড়ো, সর্ষের খোলার গুঁড়ো, মাছ ধোয়ার জল – এগুলি গাছের সার হিসেবে খুব ভাল

১০. চাল-ডালের কৌটে নিমপাতা রেখে দিলে পোকা ধরবে না।

নতুন গল্প

সুমিত রঞ্জন দাস

এই পর্যন্ত বলে ঈশ্বর থামলেন ...
সামনে শতশত অদৃশ্য সারি সারি পাইপলাইন
মানুষ আসছে হড়কে যাচ্ছে
পাইপের ভিতরে

তারপর –

সংসারের এক্কাদোক্কা খেলার চৌখুপি স্বপ্নগুলো
হাসিখুশি জানালার কাঁচ থেকে সরে সরে যাচ্ছে
এক এক করে
আবছায়া দৃশ্যগুলো হারিয়ে যাচ্ছে
অন্ধকার অতিকায় ট্যানেলে
গাড়ি বাড়ী একটা চাকরী সুন্দরী স্ত্রী
আসছে যাচ্ছে
বাঁধ ভেঙে নেমে আসছে চোখের জল
ভাসছে সবাই
ভাসছে
ভেসে যাচ্ছে ...

বাইরে খেয়াঘাটে একটা ডিঙি নৌকো
মুখ ঢেকে মাঝি অপেক্ষায়
ভাবছি এই ট্যানেল থেকে বেরিয়ে
এবারে গিয়ে চড়ব ওই ডিঙিতে

আবার না হয় নতুন কাহিনী ফাঁদবেন ঈশ্বর।

যে সরল অংকের সমাধান হলো না

পান্থজন / ফালতু লোক

প্রেম থেকে যৌনতা বিয়োগ করে তাকে সদ্যজাত অভিমান দিয়ে গুণ। প্রাপ্ত গুনফল কে বছরের প্রথম বৃষ্টি দিয়ে ভাগ করে তার সাথে নিরপরাধ নিহত ঘুমের যোগ।
ফার্স্ট ব্র্যাকেটে বদলিয়ে ফেলা রিং টোন।
সেকেন্ড ব্র্যাকেটে নির্জন করিডরে বোতাম খোলা শার্টের পাগলামি।
তৃতীয় ব্র্যাকেটে ক্যান্টিন আর সিগারেটের বিল।
আর ঈশ্বর শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস বলেছেন , পতিত জমিতে চাষ হয়না ॥

একটি পার্শ্বচরিত্র

নবীন দাস

(১)
নন্দিনী কাছে এলে একটা শব্দ
বেজে ওঠে, বারান্দার রেলিং ধরে
ফিকে আলো আসে ঘরে
তাপ পায়
তারপর বেঁচে থাকার ইচ্ছেগুলো
উঠতে থাকে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে
কখনও লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ার মতো

ঘোড়া বলতেই একসাথে চলে আসে
বন জঙ্গল অথবা লাগামের গল্প
ছুটন্ত খুরে কখনও লেগে যায় কাদা
পা বসে যায় ধুলোয় বালিতে---
এভাবেই বেড়ে ওঠে নন্দিনী

চৌকাঠে পা রাখলেই জাপটে ধরে
যৌথ পরিবার-ঠোকাঠুকি-নিঃসঙ্গতা
অন্যের ঘষা কাচে কেবলই হাততালির স্বচ্ছতা
তা সত্ত্বেও নন্দিনী লিখে চলে নিজস্ব টেবিলে
টেবিল ঘিরেই যেটুকু সংলাপ
তার কাহিনীতে ব্যর্থতার মজা নেই, তাই
শেষে আশার চমকও

তার বন্ধুর না পারাকে নিয়ে গল্প হয়
অথচ রেললাইনের মতো পাশাপাশি চলে যায় সে
নন্দিনীকে নিয়ে কোন গল্প লেখা হয় না

(২)
সে চেয়েছিলো একটা গল্প লেখা হোক
আর তার প্রথম থেকেই যারা আসবে
তারা কোন ফুল খুঁজবে না
কারণ ফুল ফোটানোর সব কাজই পুরানো হয়ে গ্যাছে
সে জানে রক্তকরবী রাখা আছে যে গল্পের পাতায়
সেখানে তার এখন অনধিকার প্রবেশ
অথবা কিছু কিছু অপাঙ্‌ক্তেয় লাগে
নিষিদ্ধ যাপনের ছবি কতই বা চলে?

রক্তকরবী মানে শুধু আরো লাল ফুল!
রক্তকরবী মানে নয় গল্পের নায়িকা?
রক্তকরবী মানে যদি ভালোবাসা হয়
অথবা এ যুগে আর রঞ্জন আসবে না.....

এ পর্যন্ত লিখে থেমে গেলে, জানি তোমরা রক্তকরবী ওল্টাতে না কোনদিনই নন্দিনী পড়তে না। আর পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়া রাজা শুধু ছায়া দেখেই ভাবতে থাকে, এ আমার রাজ্যের নিশানা--- একে অভিবাদন জানাই। ব্যাস, তক্ষুণি নন্দিনী চলে যায় গর্ভগৃহে, আর খাতা খুলে লিখতে শুরু করে......

এখন আর নায়িকা নিয়ে লেখা হয় না; ভাঙা চেয়ার অথবা মাকড়সার জালের ওপর লিখেই পুরস্কারের দৌড়। উপভোগ্য দৃশ্য বোঝাতে দু'-এক লাইন নন্দিনী আসে। অথচ তার লেখার টেবিলে আজও অনেক চরিত্রের ভীড়, অনেক গল্পের আনাগোনা। এভাবেই লিখতে লিখতে যারা পার্শ্ব চরিত্র হয়ে যায়, তাদের নিয়ে আর গল্প তৈরি হয় না।

হৃদ-নীতি

আসাদুজ্জামান সুনাম

যদি ভালবাস , তবে রাজপথে এসো
এসো করি হৃদয়ের রাজনীতি
হৃদয় পতনের আন্দোলনে
পথে নাম সর্বশক্তি নিয়ে , কূটনৈতিক দূরদর্শিতায়
তোমার ত্রাস ছড়িয়ে দাও আমার বুকে
হরতালে অচল করে দাও হৃদয়ের প্রতিটা স্পন্দন
বন্ধ করে দাও শিরা উপশিরায় রক্ত সঞ্চালন
দখল করে নাও মস্তিস্কের প্রত্যেকটা কোষ, চোখের দৃষ্টি
যদি সত্যি ই ভালবাস তবে জোর গলায়
আওয়াজ তোল - বল ভালবাসি , ভালবাসি।

দুটি কবিতা

অঙ্কিতা মাইতি

জন্ম

আকাশের গায়ে রামধনু দেখলে কি মনে হয় ?
- ভালো লাগে।
রাতের ঝকঝকে আকাশের আকাশগঙ্গা !
- ভালো লাগে।

শুধু ভালো লাগে ? আর কিছু ?
- খারাপ লাগে; সেই শিল্পীর জন্য
আর কিছু !
- খারাপ লাগে; তার সবচেয়ে বড় সৃষ্টিকে অবমাননা করার জন্য।
আর কিছু !
- খারাপ লাগে; অপমানিত শিল্পীরূপে জন্মগ্রহন করার জন্য।

সব তোমার

আপনি জানেন শান্তি কি ?

আপনি ? ... তুমি ? ... তুই ? ... জানা আছে ?

শান্তি ? কোন শান্তি ? শান্তি সেন ;
নাকি শান্তিলতা পোদ্দার ! নাকি ...

তুমি কি জানো শান্তি কোথায় ?
আপনি ? ... তুমি ? ... তুই ? ... জানা আছে ?

শান্তি ? আছে কাশি কিংবা গয়ায়
অথবা খরচ করলে কেদার-বদ্রী ...

তুই কি জানিস শান্তি কিসে পাবো ?
আপনি ? ... তুমি ? ... তুই ? ... জানা আছে ?

নিবৃত্তি!
আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতে শান্তি পায় মন।

নিবৃত্তিতে মন তো শূন্যময়,
শান্তিতে তার কিবা প্রয়োজন ?

শান্তি ? – কি ! কোথায় ! কিসে !
জানেন ? জানো? জানিস? জানা আছে ?

তখন শান্তি; যখন আমার সব তোমার করে নাও।

অনেকবার কায়দা করেও যখন সুমন্ত্রবাবু কিছুতেই জানতে পারলেন না, দীপ্তদা এক্সাটলি কিসে চাকরি করে, তখন বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। দীপ্তদাও

ঠোঁটের কোণে একচিলতে বিজয়ীর হাসি নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমায় বলল, "পটলা, ঊটির আসল নাম জানিস তো?"

এটা দীপ্তদার খুব বাজে অভ্যাস। আমায় রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে লোকজনের সামনে 'পটলা' বলে ডাকা। 'পটলা' মোটেই আমার নাম নয়, কোন কালে ছিল না। আমার দিব্যি একটা ভালো নাম আছে, বৈশ্যম্পায়ন চৌধুরি। আর ডাকনাম 'অ্যাস্টেরিক্স'। সেটা থেকে 'পটলা'টা কিভাবে ডিরাইভড্ হতে পারে তা দীপ্তদা ছাড়া কেউ জানেনা।

আমি প্যাঁচার মত মুখ করে বললাম, 'কি একটা উদগাপুত্তলাম, না কি যেন, উইকিপিডিয়াতে দেখেছিলাম। মনে নেই।'

এর অবধারিত ফল হিসাবে প্রাপ্য গাঁট্টাটা অনেক কায়দা করেও এড়াতে পারলাম না। দীপ্তদা বলল, "উদগাপুত্তলাম নয় রে, গাধা, উদগামন্ডলম্ বা উটকামন্ড। উটকামন্ড নামটা অবশ্য সাহেবদের দেওয়া"।

আবার 'গাধা' বলল! আর নেওয়া যাচ্ছে না। এবার আশু বিদ্রোহ করা দরকার। আর আমার এরকম হেনস্থা দেখে সুমন্ত্রবাবু সামনের সিটে বসে কুমীরের মত দাঁত বার করে হাসছেন। দেখে গা-পিত্তি জ্বলে গেল। হোটেলে পৌঁছে দীপ্তদাকে ভালো করে ঝাড় দেব। কিভাবে দেব সেটাই প্ল্যান করার জন্য জানলা দিয়ে ওয়ান ফোর্থ মুন্ডু বের করে মন দিয়ে ভাবতে লাগলাম।

দীপ্তদার ভালো নাম দীপ্তমান রায়চৌধুরি। ও মোটেই আমার নিজের দাদা নয়। কস্মিনকালে ছিলো না, থাকতে পারেনা। এরকম একটা নির্দয় পাষানের মত দাদা আমার মোটেই চাইনা। খালি কথায় কথায় প্রশ্ন করে, আর না পারলে গাঁট্টা মারে। এক একটা গাঁট্টার কি জোর! যেন আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে! ও আমার পিসতুতো দাদা। আমার চেয়ে প্রায় বারো বছরের বড়। কলেজ-টলেজ পাশ করে গেছে অনেক কাল আগে, আমি যখন ফাইভে পড়ি। তারপর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে চাকরি পেয়েছিল। এই ছয় বছরে প্রোমোশন-টোমোশন পেয়ে খুব কিছু একটা হয়ে গেছে। কি হয়েছে কাউকে বলেনা। এটা নাকি ওদের মন্ত্রগুপ্তি। যত্ত ঢপবাজি। অফিস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে কিনা, কে জানে। তাই হয়ত বলেনা কাউকে। এই যেমন একটু আগে টয়ট্রেনে সুমন্ত্রবাবুকে তো কিসে চাকরি করে, সেটাই বলল না। খালি বলল, 'সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা চাকরি করি'। সুমন্ত্রবাবু তো জানার জন্য প্রায় কৌন বনেগা ক্রোড়পতি খেলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাও ভাঙতে পারলেন না। হুঁ হুঁ বাবা, এত সহজ, এ হল আমার দাদা! এর পেট থেকে কথা বের করা আর সুপুরির জুস বানানো একই ব্যাপার!

ওহ্, ভুলে গেছি বলতে। আমরা উটি যাচ্ছি। শীতে স্কুলের পরীক্ষা হয়ে গিয়ে বেশ একটা ছুটি পেলাম। কি করব কি করব ভাবছিলাম। হঠাৎ দীপ্তদা একদিন এসে হাজির। বাবাকে, মাকে প্রণাম-ট্রণাম করে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। হাতে আবার এক বাক্স গোলাপের পাপড়ি দেওয়া সন্দেশ। ব্যাপারটা ঠিক সুবিধের ঠেকল না। এত পটাচ্ছে মানেই কিছু একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে। যা ভেবেছি, ঠিক তাই। কথায় কথায় বাবাকে বলল, যে ও নাকি একটা ছোট্ট কাজে চেন্নাই যাচ্ছে। কাজটা এক ঘন্টার। তারপর কয়েকদিন ছুটি আছে। তাই ভাবছে উটি ঘুরে আসবে। আমাকে সাথে নিয়ে যেতে চায়। একা একা কি আর বেড়াতে ভালো লাগে! শুনে খুব খারাপ লাগলনা প্রস্তাবটা। যদিও কথায় কথায় ওর জ্ঞান দেওয়া আর না পারলে গাঁট্টা মারার কথাটা ভেবে ব্রহ্মতালুর ওপরটা সুড়সুড় করে চুলকাতে লাগল, কিন্তু তারপর ভেবে দেখলাম বেশ ছুটি কাটানোও হবে আর নতুন একটা জায়গা দেখাও হবে। উটিতে তো কত সিনেমার শুটিং-টুটিং হয় শুনেছি। এরকম একটা জায়গা ঘুরে আসা হবে বেশ। তাই মনে মনে ওকে ক্ষমা-ঘেন্না করে দিয়ে রাজিই হয়ে গেলাম।

পরশুদিনই চেন্নাইতে ওর কাজটা হয়ে গেছে। তারপর মেরিনা বিচ এটা ওটা দেখে সময় কাটিয়ে কাল রাতে আমরা উটির ট্রেনে চেপে বসেছি। চেন্নাই থেকে ডাইরেক্ট কোন ট্রেন নেই। চেন্নাই থেকে মেট্টুপালায়াম বলে একটা জায়গা অব্দি ট্রেনে আসতে হয়। তারপর টয়ট্রেনে করে উটি। কোন ছোটবেলায় দার্জিলিং গেছিলাম, সেখানে টয়ট্রেন চড়েছিলাম কিনা মনেও নেই। বাবা বলে চড়েছিলাম, তাই বিশ্বাস করে নিই। তাই এখানে টয়ট্রেন চড়তে হবে ভেবে খুব এক্সাইটেড হয়েছিলাম। আজ সকালে মেট্টুপালায়ামে নেমেই এই সুমন্ত্রবাবুদের সাথে আলাপ। সুমন্ত্র সেন। কোলকাতার একটা ট্রাভেল এজেন্সি চালান। সেরকম বড় কিছু নয়। পাশাপাশি পৈতৃক ব্যাবসা আছে। সেটাই প্রধান জীবিকা। বেড়াতে ভালো লাগে, তাই একটা ছোট ট্রাভেল এজেন্সি খুলেছেন। বেড়ানোও হবে, আর দুপয়সা কামানোও যাবে সেই সুযোগে। এবার উটি চলেছেন সাত জনের একটা দল নিয়ে। বাঙালি দেখে নিজেই এসে আমাদের সাথে আলাপ করলেন।

মেট্টুপালায়ামে আমাদের টয়ট্রেনের জন্য ঘন্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হল। আসলে এই চেন্নাইএর ট্রেনটা নাকি অন্যান্য দিন একটু লেট করে। কিন্তু এদিন নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষন আগেই ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই স্টেশনে বসে ব্রেকফাস্টের সাথে আলাপ পরিচয়ও চলল সবার সাথে। সুমন্ত্রবাবু ছাড়া বাকিদের মধ্যে একজন বয়স্ক মানুষ রয়েছেন। বয়ষ্ক বলতে ‘বৃদ্ধ’ নন, এই বছর ষাটেক বয়েস হবে। শুনলাম উনি নাকি ক্রিকেটার ছিলেন। নাম হিরণ্ময় চ্যাটার্জি। ক্রিকেটার শুনে বেশ উৎসাহ পেয়েছিলাম প্রথমে। তারপর শুনলাম বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলেছেন কয়েক বছর। ইন্ডিয়ায় খেলেননি শুনে আর খুব একটা ইন্টারেস্ট পেলাম না। মন দিয়ে ইডলি আর বড়ার সৎকার করতে লাগলাম। হিরণ্ময়বাবু ওনার ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। ছেলের বয়েস বছর তিরিশেক। মৃণ্ময় চ্যাটার্জি। তিনিও কিছুদিন ব্যাট-বল নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাড়ার মাঠের বেশি ওঠা হয়নি। এখন একটা কোম্পানির সেলসে আছেন। সঙ্গে আরো একজন আছে। ইনি মৃণ্ময়বাবুর বন্ধু। সোমক রায়। কি করেন জানিনা। বাকি পাঁচজনের মধ্যে এক দম্পতি। দেখেই মনে হচ্ছে নব বিবাহিত। সবসময় কেমন যেন একসাথে লেগে লেগে রয়েছে। বয়েস ওই তিরিশের বেশি হবেনা। অর্ক দেব আর মিসেস অপর্ণা দেব। আমি ইলেভেনে পড়ি শুনে মিসেস দেব এসে আমার গাল টিপে বললেন, “ও মা। তুমি এত বড় নাকি! আমি তো ভাবলাম সেভেন এইটে পড়। দেখলে তো মনেই হয়না।” ন্যাকা! শুনে খুব রাগ হল। বাকি দুজনের মধ্যে শুভ্রাংশু সোমের একটা রেস্তোরাঁ আছে। ঢাকুরিয়ার কাছে। আর আলাপন দে একটি সংবাদপত্রের অফিসে কাজ করেন। ভাব দেখে মনে হয়, আমাদের মত নিতান্ত অর্বাচীনদের মধ্যে এসে পড়ে খুব বিড়ম্বনায় পড়েছেন। চোখে একটা নামী ব্রান্ডের সানগ্লাস। যদিও দীপ্তদা পরে বলেছিল ওটা নাকি ধর্মতলা থেকে কেনা। দাম দুশো তিপ্পান্ন টাকা, সেটা একটা ডাঁটির ভিতরে মার্কার দিয়ে নাকি লেখা আছে। লেখাটা মুছে এলেও, একেবারে ওঠেনি। দীপ্তদা এরকম অনেক কিছু ‘অবসার্ভ’ করে। গুল মারে কিনা জানিনা। তবে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারিনা। যাই হোক, এই ভদ্রলোককে আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি।

দীপ্তদা দেখলাম হিরণ্ময়বাবুর সাথে বেশ আলাপ জমিয়েছে। দীপ্তদা নিজে কোনদিন ক্রিকেট খেলেছে কিনা আমি জানিনা, তবে খেলা দেখতে ভালোবাসে। ইডেনে খেলা থাকলে নিয়মিত যায়। আমাকেও বেশ কয়েকবার নিয়ে গেছে। তাই দুজনে মিলে বেশ ক্রিকেটের হিস্ট্রি নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছে দেখলাম। আর পাঁচজন বুড়ো লোকের মত, ‘আমাদের সময়ে সব কিছু ভালো ছিল’ শুরু করেছেন ভদ্রলোক। টি-টোয়েন্টি এসে ক্রিকেটের সর্বনাশ করছে, বলে প্রায় কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

উটিতে পৌঁছে সুমন্ত্রবাবু যেই শুনলেন যে আমাদের হোটেল বুক করা নেই, আমরা হোটেল খুঁজতে বেরবো, আমাদের আর ছাড়লেন না। বললেন, ওনাদের সাথে যেতে। উনি নাকি এই নিয়ে প্রায় পাঁচ বার উটি এলেন। আর এলে এই হোটেলেই ওঠেন। তাই গেলে সব ব্যাবস্থা হয়ে যাবে। মোবাইল থেকে ফোন করে কনফার্মও করে দিলেন রুম খালি আছে। দীপ্তদাও

দেখলাম আর হোটেল খুঁজতে হবেনা বলে খুশিই হল। হোটেলটা লেকের পাড়ে। উটি শহরটা বেশ সুন্দর। ছিমছাম হিল স্টেশন। মধ্যিখানে একটা লেক আছে। ওটা নাকি আর্টিফিশিয়াল লেক। একটা বড় ন্যাচারাল লেক শহরের বাইরে আছে। আমরা পরদিন সেখানে যাব ঠিক করলাম। স্টেশন থেকে তিনটে অটো ভাড়া করা হল। হোটেল লেকভিউ উটি। হোটেলে অফ সিজ্‌ন বলে তেমন লোক নেই। আমরা ছাড়া আর একজন বিদেশী। চায়ের টেবিলে ওঁর অ্যাকসেন্ট শুনে দীপ্তদা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, “জার্মান”।

আমাদের ঘরটা লেকের দিকে পাইনি। তবে হোটেলটা খুব সুন্দর। লেকের দিকের একটা সিঙ্গল রুমে হিরণ্ময়বাবু। পাশের ডবল রুমে ওনার ছেলে আর তাঁর বন্ধু। মিসেস দেব, আমরা যখন থেকে দেখছি, তখন থেকে ঘ্যান ঘ্যান করে চলেছেন তাঁর লেকভিউ ঘর চাই বলে। সুমন্ত্রবাবু অনেকবার আশ্বাস দেওয়ার পরও এই হোটেলে ঘর পাওয়ার আগে অবধি সেটা চলেছে। লেকভিউ ঘর পেয়ে খুশিতে দুজনে ঘরে ঢুকে সেই দরজা দিয়েছেন, চা খেতেও নামলেন না। সুমন্ত্রবাবু নিচে একটা সিঙ্গল রুম নিয়েছেন। বাকি তিনজনের মধ্যে সাংবাদিক মশাই কারো সাথে রুম শেয়ার করা পছন্দ করেন না বলে তাঁকে একটা সিঙ্গল রুম দেওয়া হয়েছে। অগত্যা শুভ্রাংশুবাবুরও তাই।

দীপ্তদা ঘরে ঢুকে জুতো-মোজা খুলতে খুলতে বলল, “বুঝলি, পটলা, এই ভদ্রলোকের নাম কোথায় শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিনা। হিরণ্ময় চ্যাটার্জি। একবার ইন্টারনেটে দেখতে হবে।”

আবার ‘পটলা’ শুনে ভুলে যাওয়া রাগটা আবার ফিরে এল। “তুমি ওরকম লোকজনের সামনে পটলা পটলা করবেনা বলে দিচ্ছি কিন্তু। আমার কি একটা ইয়ে নেই?”

দীপ্তদা বেশ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়, তারপর খুব জোরে হাসতে থাকে। তাই দেখে আরো রাগ হয়ে গেল। “হাসছ কেন?”

“সত্যি রে, ভুলেই গেছিলাম। তোর তো ক্লাস ইলেভেন। তোর তো একটা ইয়ে আছে।” হাসতে হাসতেই বলে দীপ্তদা, “সরি বাবা, পটলানন্দ”। শুনে আমারও খুব হাসি পেয়ে গেল। খুব এক চোট হাসার পর বললাম, “যাক্ গে, অ্যাপোলজি অ্যাক্সেপ্টেড। এবার বল কি বলছিলে?”

“হুম্। বলছিলাম যে, এই ভদ্রলোকের নামটা কোথাও শুনেছি শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। এমন কিছু বড় ক্রিকেটার ছিলেন না যে কোন রেকর্ড বইতে দেখতে পাব। সেটাই ভাবছি, “ ব্যাগ থেকে ওর নতুন কেনা আই-প্যাডটা বের করতে করতে বলল। “যা, তুই স্নান করে আয়। গরম জলে করিস। নাহলে ঠান্ডা লেগে যাবে।” বলে বিছানায় উঠে হেলান দিয়ে আই-প্যাডটা অন করে।

ঠান্ডা গরম জল মিশিয়ে স্নান করে বেশ আরাম হল। জার্নির পর এরকম একটা হট বাথ নিলে বেশ ফ্রেশ লাগে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি দীপ্তদা জামা-প্যান্ট পালটে রেডি। “একি, তুমি স্নান করবে না? কোথায় যাচ্ছ?” বলি আমি।

“নাহ্। এসে করব। নতুন জায়গা। চল একটা রাউন্ড মেরে আসি। শিগগির রেডি হয়ে নে।” জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলে। কাঁধে ওর ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে নিয়েছে। আমি জানি ওর মধ্যে ওর সেই দেড় ফুট লম্বা লেন্স ওয়ালা ক্যামেরাটা আছে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা অটো নিলাম। এখানকার অটোগুলো কলকাতার মত নয়। বরং কোলকাতার ট্যাক্সির মত ব্যবহার হয় এখানে। তবে মিটার-ফিটারের কোন বালাই নেই। যা হোক কিছু চায়, একটু দরাদরি করে যা দাঁড়াবে দিতে হবে। অটোতে উঠে মার্কেটের দিকে

চললাম। হোটেলের থেকে একটু এগিয়ে দেখি সোমকবাবু রাস্তার পাশে স্থানীয় একজনের সাথে কথা বলছেন। আমাদের লক্ষ্য করলেন না। দীপ্তদাও দেখেছে। কিছু বলল না।

এখানের চকোলেট যে খুব বিখ্যাত জানতাম না। অটোতে আসতে আসতে দীপ্তদা বলল। মার্কেটে এসে দেখলাম গাদা গাদা সারি দিয়ে সব চকোলেটের দোকান। আমরা পছন্দ করে একটা বড় সড় দোকানে ঢুকলাম। হরেক রকম চকোলেট সব সাজানো রয়েছে। আমার তো দেখে বেজায় লোভ লাগল। পছন্দ মত ছ-সাত রকম চকোলেট মিশিয়ে কেনা হল এক প্যাকেট। দোকান থেকে বেরোতে যাব, এমন সময় দেখি দেব দম্পতি হাজির।

"কি চকোলেট কিনতে?" দীপ্তদা প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, জানেনই তো মেয়েরা কেমন চকোলেট পাগল হয়। হেঁ হেঁ। এখানে এসেই শুনেছে যে এখানকার চকোলেট খুব বিখ্যাত। ব্যস্, আমায় টেনে আনল। আপনারা কিনলেন?" মিঃ দেব বললেন। ততক্ষণে মিসেস দেব চকোলেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

"হ্যাঁ। আমার এই ভাইটিও চকোলেটের ভক্ত।" ইশস্, নিজে যেন খায়না।

"ঠিক আছে, যাই দেখি। সাংবাদিক মশাইও তো এলেন আমাদের সাথে। আশেপাশে আছেন কোথাও। চলি।" বলে স্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে ঢুকে যান দোকানে। আমি আর দীপ্তদা বেরিয়ে আসি। পাশের একটা সিগারেটের দোকান থেকে আলাপনবাবু বেরিয়ে আসেন।

"এখানের লোকেদের সাথে কমুনিকেট করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বুঝলেন?" সিগারেট ধরিয়ে বলেন আলাপনবাবু।

"হ্যাঁ, সেতো দক্ষিণের সব রাজ্যেই প্রায়।" দীপ্ত দা বলে।

"না মশাই। ব্যাঙ্গালোর বা হায়দ্রাবাদ যান। এতো সমস্যা হবেনা। তামিলনাড়ুতে সমস্যাটা বেশি। আমি লক্ষ্য করেছি।"

"হ্যাঁ, তা হবে হয়তো।"

"কি, চকোলেট কেনা হল? কি যেন নাম তোমার?" আমার দিকে ফিরে বলেন ভদ্রলোক। আমার মোটেই উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না। তাও বললাম, "হ্যাঁ। বৈশ্যম্পায়ন। ডাক নাম, অ্যাস্টেরিক্স।"

'অ্যাস্টেরিক্স, দ্য গল! বাহ্, বেশ নাম তো।" তারপর দাদার দিকে ফিরে বলল, "চলুন এক কাপ চা খাই।"

সামনের একটা ছোট ক্যাফেতে ঢুকে বসলাম। আমার জন্য একটা অরেঞ্জ লাইম, আর ওদের জন্য নীলগিরি টি। আলাপনবাবু চায়ে চিনি খাননা। বললেন, উনি নাকি ডায়েবেটিক।

"আপনি কি করেন?" ভদ্রলোক সরাসরি প্রশ্ন করে দীপ্তদাকে।

চায়ে একটা সুগার কিউব ফেলে নাড়তে নাড়তে দীপ্তদা বলে, "সরকারি চাকরি।"

"অহ্। আর রাজ্যের যা অবস্থা! মাইনেপত্র কদিন পর আর দেবেনা বোধহয়। বলবে..." ভদ্রলোকের কথার মাঝখানে আটকে দিয়ে দীপ্তদা বলে, "না, আমারটা সেন্ট্রাল।"

"যাক্। তাহলে অবশ্য চিন্তা নেই। তা কিসে আছেন?" আবার সেই শুরু হল। আমি তাড়াতাড়ি দীপ্তদাকে বাঁচানোর জন্য, মনে পড়ে গেছে এই ভাবে বললাম, "তুমি বিকেলে বলছিলে, ওই ভদ্রলোকের সম্পর্কে, কিছু পেলে ইন্টারনেটে?"

"নাহ্। সেরকম কিছু পাইনি।" দীপ্তদা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা প্রশংসাসূচক হাসি দেয়।

"কার সম্পর্কে বলুন তো?" আলাপনের কৌতূহল।

“ওই হিরণ্ময়বাবু। অ্যাস্টেরিক্সকে বলছিলাম, যে ওনার নামটা আগে কোথাও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মনে করতে পারছিনা।” যাক্, এবার তাও ‘পটলা’ বলেনি।

“ওহ্।” বলে আলাপনবাবু একটু চুপ করে গেলেন। তারপর আবার বললেন, “রমন লাম্বার নাম শুনেছেন তো?”

“হ্যাঁ। সে তো ক্রিকেটার ছিল।” আমি বলে উঠি।

“ঠিক বলেছ। কিভাবে মারা গেছিলেন, জান?” আমার দিকে ফিরে বললেন।

রমন লাম্বা কিভাবে মারা গেছিল, তা আমার মনে পড়ল না। বললাম, “নাহ্, তা তো মনে পড়ছেনা”।

“শর্ট লেগে ফিল্ডিং করার সময় মাথায় বল লেগে মারা যান। এই বার মনে পড়েছে।” দীপ্তদা বলে।

“ শীর্ষেন্দু বাগচী। মোহনবাগানের প্লেয়ার ছিলেন। ঠিক ওই একই ভাবে মারা যান ময়দানে। সেভেন্টিটু-থ্রি হবে। মনে নেই এক্সাক্টলি। শর্ট লেগে ফিল্ডিং করছিলেন। ব্যাটস্ম্যান ছিলেন এই হিরণ্ময় চ্যাটার্জি। তখন হেলমেটের অত বালাই ছিল না ক্লাব ক্রিকেটে। লাগার সাথে সাথে স্পট ডেড। তখন কাগজে এই নিয়ে বেশ হইচই হয়েছিল।” আলাপনবাবু চায়ে চুমুক দেন, দিয়ে “আঃ” করে তৃপ্তির আওয়াজ করেন। এরকম বেশ একটা সুন্দর বিকেলে এরকম বিচ্ছিরি ভাবে মৃত্যুর কথা শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। একটানে জুস্‌টা শেষ করে দিয়ে টেবিল-ক্লথের কোণা খুঁটতে লাগলাম। দীপ্তদা শুধু একটা “হুম্” বলে চুপ করে গেছে।

“বাহ্। আপনি বেশ খবর রাখেন তো।” দীপ্তদা বলল।

“সাংবাদিকদের কাজই তো তাই। তা, আপনারা এখানে কতদিন আছেন?” আলাপনবাবুই আবার প্রশ্ন করেন।

“চার দিন। আপনারাও তো বোধহয় চারদিন। সুমন্ত্রবাবু বলছিলেন।” দীপ্তদা এক চুমুকে বাকি চা টুকু শেষ করে দেয়।

“হ্যাঁ। কাল তো আমরা পাইকারার দিকটা যাব। আপনারাও ঝুলে পড়ুন না আমাদের সাথে।”

“ভাবছিলাম। আপনারা কিসে যাবেন?”

“সুমন্ত্রবাবু তো বললেন বড় টেন সিটার গাড়ি করছেন। আমরা তো আটজন আপনারা দুজন দিব্যি এঁটে যাবেন।”

“হ্যাঁ, তা ঠিক। দেখি সুমন্ত্রবাবুর সাথে কথা বলে।” চায়ের দাম মিটিয়ে উঠে পড়ি আমরা। আলাপনবাবু লোকটাকে প্রথমে দেখে যতটা খারাপ লাগছিল, এখন আর ততটা লাগছে না। সন্ধ্যে হয়ে আসার সাথে বেশ ঠান্ডা লাগছে। উইন্ডচিটারের চেনটা গলা অবধি টেনে নিলাম। দীপ্তদা আবার একটা মাফলার জড়িয়েছে। আলাপনবাবু মার্কেটটা ঘুরে দেখবেন বলে ওদিকে চলে গেলেন। দীপ্তদা বলল হেঁটেই ফিরবে। ও বেশ কিছু ছবি তুলেছে। মার্কেটের, রাস্তার। আমি, মার্কেট রাস্তা এসবের ছবি তুলে কি হবে জিজ্ঞেস করাতে বলল, যে জায়গায় গেছি, তার একটা রিগোরাস ফটোগ্রাফিক ডকুমেন্টেশন রাখা দরকার। পরে দেখতে ভালো লাগে।

আসার পথে দীপ্তদার সাথে গানের লড়াই খেললাম। ও এক কালে বেশ কয়েক বছর রবীন্দ্রসংগীত শিখত। গলাটা খারাপ হয়ে গেলেও মিউজিকের সেন্সটা খুব ভালো আছে। বাবাও বলে। আর অনেকরকম মিউজিক শোনে। ও শিস্ দিয়ে কি একটা সুর করছিল। আমাদের বাড়িতে মায়ের কেনা হিমাংশু দত্তের একটা সিডি ছিল। সেটা কয়েকবার শুনেছি। ওর শিস্ শুনে তাই চেনা লাগাতে বললাম, “এটা সেই গানটা না, ‘তোমারি পথ পানে চাহি’?” ও শিস্ থামিয়ে বলল, “নাহ্। এটা মোৎজার্টের হর্ন কন্সার্টো। হিমাংশু দত্ত এটা থেকেই ইন্সপায়ার্ড হয়ে ওই গানটার সুর দেন। এরকম অনেক এক্সাম্পেল আছে।” আমি মোৎজার্ট-টোৎজার্ট শুনে যাকে বলে ‘হাইলি এক্সাইটেড’ হয়ে ওকে বললাম, “চলো, গানের লড়াই খেলি”।

ফিরে এসে দেখলাম সুমন্ত্রবাবু 'ক্যাম্প ফায়ার' বসিয়েছেন। 'ফায়ার' টুকু নেই এই যা। সবাই বেশ দোতলার লবিতে জড় হয়েছেন। আমাদেরও ডাকলেন যোগ দেওয়ার জন্য। সবার সাথে ইন্টার্যাকশনের পাশাপাশি গান-কবিতা। যে যা পারে আর কি। একে একে দেব দম্পতি আর আলাপনবাবুও এসে গেলেন। মিসেস দেব ভালো গান করেন দেখলাম। একবার বলাতেই স্বতস্ফুর্ত হয়ে শুনিয়ে দিলেন, "ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতল জলের আহ্বান।" মাঝে একটু কথা ভুলে গেছিলেন। দীপ্তদা ধরিয়ে দিল। শুভ্রাংশুবাবু এককালে নাটক করতেন পাড়ায়। 'ডাকঘর'এ পিশোমশাই-এর কয়েক লাইন ডায়ালগ শুনিয়ে দিলেন।

হিরণ্ময়বাবু একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখালেন। একটা উইকেটের বেল। খাওয়ার শেষে খুব নাটকীয় ভাবে টেবিলের ওপর রাখলেন জিনিসটা। রেখে বললেন, "এটার একটা বিশেষত্ব আছে। কেউ আন্দাজ করতে পারেন?"

দীপ্তদা বলল, "গায়ে তো দেখছি ডন ব্র্যাডম্যানের অটোগ্রাফ করা।"

"এক্স্যাক্টলি। এটা এমসিজিতে ঊনিশশো আটত্রিশের ব্র্যাডম্যানের দুশো সত্তর করা ইনিংসের বেল। এটা আমার বাবার কালেকশন। ব্র্যাডম্যান নিজে হাতে বাবাকে অটোগ্রাফ করে দিয়েছিলেন।"

"আপনি এরকম একটা দামী জিনিস এভাবে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ তো নিলামে চড়ালে কত যে দাম উঠবে তার ঠিক নেই।" দীপ্তদা বেলটা সাবধানে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বলল। এইসব শুনে তো আমার পুরো গায়ের সব রোম খাড়া হয়ে উঠেছে। আমিও দীপ্তদার হাত থেকে জিনিসটা নিলাম ধরে দেখার জন্য।

"হ্যাঁ, সে তো জানি। তাই বলিনা কাউকে। আপনাদের বললাম। আসলে এটা আমার কাছে খুব পয়া। মানে এ ব্যাপারে আমি একটু পুরোনপন্থী। আমার কাছে তাই এটা সবসময় থাকে। এমনকি খেলার সময়ও কিটস্ ব্যাগে থাকতো।"

রাতে খাওয়ার টেবিলেও সবার সাথে দেখা হল। শুভ্রাংশুবাবু খাবার নিয়ে খুব খুঁত খুঁত করছিলেন। ওঁর রেস্তোঁরাতে নাকি এর চেয়ে অনেক ভালো খাবার হয়। চিকেনের মধ্যে এত কারি পাতা কেন দেয় ইত্যাদি নানারকম বিষয় নিয়ে খুব বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। টেবিলে বসে পাশে বসা দীপ্তদাকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "মশাই, এখানে যদি একটা বাঙালি রেস্টুরেন্ট খোলা যায় না, দারুন চলবে।"

দীপ্তদা ততোধিক ফিস্‌ফিসিয়ে বল, "হবে ভালোই। তবে কারি পাতা দিয়ে আলু পোস্ত রান্না করাটা জানতে হবে। আপনি ভাবছেন নাকি যে খুলবেন?"

"ভাবছি। তবে একটা ঠিকঠাক বিস্‌নেস প্ল্যান বানাতে হবে।এখানে জমির দাম কিরকম হবে বলুন তো?"

"সেটা তো বলতে পারবনা। তবে হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

"হ্যাঁ। সেতো পারি। কিন্তু এরা আবার হিন্দি বোঝেনা। আমার আবার ইংরাজিটা যাকে বলে আর কি একটু... হেঁ হেঁ মানে বুঝতেই পারছেন। বাদুড়বাগান বয়েজ থেকে পাশ করেছি তো। ইংরাজিতে তেতাল্লিশের বেশি পাইনি কখনো।"

"ঠিক আছে, আমি না হয় জেনে দেব।" দীপ্তদা আশ্বস্ত করে ভদ্রলোককে।

রাতে নরম বিছানায় মোটা কম্বলের টানন এরকম কোথায় শুয়ে আছি। দীপ্তদা করছে আর কানে হেডফোন দিয়ে গান সুমন্ত্রবাবুর সাথে কথা বলেছে দীপ্তদা।

রাতে ঘুমিয়ে বেশ একটা অদ্ভুত স্বপ্ন মাঠে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। হিরণ্ময়বাবু বল

তলায় ঢুকে মনেহল যেন স্বর্গের নন্দন কানন- দেখলাম আইপ্যাড নিয়ে বসে কিসব খুটখাট শুনছে। সকালে নটায় বেরোতে হবে। আমরা একসাথেই পাইকারা যাচ্ছি।

দেখলাম। দেখলাম আমাদের বাড়ির পাশের করছেন আর আলাপনবাবু ব্যাট। কিন্তু বলের

বদলে একটা ইয়া বড় কয়েতবেল। তার গায়ে আবার ব্র্যাডম্যানের সই করা। আমার পাশে দাঁড়িয়ে শুভ্রাংশুবাবু বলছেন, "আচ্ছা, ভাই, এই বেলের শরবতের একটা দোকান দিলে হয়না? তেতাল্লিশ টাকা এক গ্লাস। কিন্তু বাদুড়বাগানে জমি দরকার। আমি তো ইংরাজি জানিনা।" এমন সময় হিরণ্ময়বাবু একটা ছক্কা হাঁকড়েছেন। আর আমি দেখলাম বেলটা আমার মাথা লক্ষ্য করে সোজা উড়ে আসছে। দেখে ভয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকাল হয়ে গেছে। দীপ্তদা বাথরুম থেকে বেরোচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, "যাহ্, রেডি হয়ে নে। আটটা বাজে। নটায় গাড়ি আসবে।"

রেডি হয়ে রুম থেকে বেরিয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে দেখি দেব দম্পতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একে অন্যের ফোটো শুট করছেন। দীপ্তদাকে দেখে মিঃ দেব বললেন, "এই যে, ফোটোগ্রাফার মশাই। আপনার ওই ক্যামেরায় আমাদের দুজনের একটা ফোটো তুলে দেবেন? আমায় পরে মেইল করে দেবেন।"

"উইথ প্লেজার, " বলে দীপ্তদা ওদের ছবি তুলে দিতে গেল। আমি মনের সুখে ওমলেট টোস্ট উদরসাৎ করতে লাগলাম। খানিক্ষন পরে দীপ্তদা এসে বসল। বুঝলাম এক ছবিতে দেব-দেবী খুশি হন নি। বেশ কয়েকটা তুলে তবে ছাড়া পেয়েছে।

বলা হয়নি এর মধ্যে সোমক রায়ের সাথে একবারই কথা হয়েছে। ভদ্রলোক ভয়ানক রকম গম্ভীর। শুধু নিজের বন্ধু ছাড়া আর কারো সাথে কথা বলেন বলে মনেহয় না। মৃণ্ময়বাবুও তাই। আমাদের সাথে, মানে দীপ্তদার সাথে, কেমন আছেন, সন্ধ্যা হলে ঠান্ডা পরে এইরকম দু একটা কথা হয়েছে শুধু।

গাড়িতে উঠে আমরা পাইকারার দিকে চলতে লাগলাম। রাস্তার দুপাশে বিশাল বড় গল্‌ফ কোর্স। সব আর্মির এলাকা। এখানে বেশ বড় একটা আর্মির ট্রেনিং ক্যাম্প আছে। গাড়িটা একটা পাইন বনের ধারে এসে দাঁড়ালো। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা বিস্তৃত পাইন বন নেমে গেছে। ড্রাইভার সান্তানাম আমাদের বলল, ওই বনের ভিতর দিয়ে নেমে গেলে একটা বিশাল লেক দেখতে পাওয়া যাবে। এত সকাল আর অফ সিজ্‌ন বলে কিনা জানিনা, আমরা ছাড়া আর কোন টুরিস্ট চোখে পড়ল না। দীপ্তদা ইতিমধ্যে গল্‌ফ কোর্সের পাশে দাঁড়িয়ে সবার একটা গ্রুপ ফোটো তুলেছে। দেব-দম্পতি তো ছবি তোলার জন্য সবসময় উৎসাহী। বাকিরাও বেশ Say Cheese বলে পোজ দিয়েছে। শুধু শুভ্রাংশুবাবু একটু অলস। গাড়ি থেকে নামতেই চান না। তারপর অনেক বলার পর নামানো হল।

পাইন বনের ভিতর দিয়ে নিচে নামতে গিয়ে দুটো ঘটনা ঘটল। শুভ্রাংশুবাবু পাইনের ফুল পারার জন্য লাফিয়ে গাছের ডাল ধরতে গিয়ে হাতের কব্জির কাছটা ছড়লেন আর হিরণ্ময়বাবু একবার পড়ে গেলেন। সবাই মিলে ধরে তোলা হল। লাগেনি সেরকম। বললেন কিছুতে পা আটকে পড়ে গেছেন। গাছের শিকর-বাকর ছড়ানো চারিদিকে।

নিচে নেমে যে এত সুন্দর দৃশ্য দেখব কল্পনাও করতে পারিনি। দীপ্তদা তো ক্যামেরা নিয়ে পাগল হয়ে গেল পুরো। এবার দেব দম্পতির দাবি অনুযায়ী আবার সবার গ্রুপ ফোটো তোলা হল লেকের ধারে দাঁড়িয়ে। গ্রুপ ফোটো তুলে সবাইকে খুশি করে, দীপ্তদা ক্যামেরা নিয়ে লেকের ধার ধরে খানিকটা এগিয়ে গেল। মিসেস দেব নানা রকম পোজ দিতে লেগেছেন, আর মিঃ দেব ওনার পয়েন্ট অ্যান্ড শুটে খুব ফোটো তুলছেন। বুঝলাম এগুলো ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার হবে।

জলের মধ্যে কত পাখি। সব মাইগ্রেটরি বার্ডস। দারুন লাগছে। দীপ্তদা নিশ্চয়ই ওইদিকে গিয়ে অনেক ছবি তুলছে। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে এদিক ওদিক। আলাপনবাবু দেখলাম জঙ্গলের মধ্যে থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে এলেন। এরকম সুন্দর পরিবেশে কারোর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে!

একটু পরে, সুমন্ত্রবাবু সবাইকে ফিরতে বললেন। কারণ এখনো অনেক জায়গা যাওয়ার আছে। এখানে এত দেরী করলে হবেনা। সেসব জায়গা নাকি আরো সুন্দর। দীপ্তদাকে আশেপাশে দেখলাম না। নিশ্চয়ই ফিরে আসবে ভেবে আমি বাকি দের

সাথে উঠতে লাগলাম গাড়ির দিকে। গাড়িতে এসে সবাই পৌঁছে যাওয়ার পরেও ও এসে পৌঁছালনা। সুমন্ত্রবাবু বললেন, "ফোটো তুলতে কোথায় মগ্ন হয়ে গেছেন দেখ গিয়ে। ওনার মোবাইলের নাম্বার জান? তাহলে ফোন করি।" দীপ্তদার নাম্বারটা মনেই

থাকে। বললাম। কিন্তু অনেকবার রিং হওয়ার পরেও যখন তুললনা, তখন আমার ভয় করতে লাগল। সুমন্ত্রবাবু বললেন, "চল তো খুঁজে দেখি।" বাকিদের গাড়িতে বসতে বলে আমরা দুজন ওর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে জংগলের মধ্যে দিয়ে নেমে গেলাম খানিকটা। আমি দেখেছিলাম, দীপ্তদাকে লেকের ধার ধরে খানিকটা এগিয়ে যেতে। তাই সুমন্ত্রবাবুকে নিয়ে ওই দিকে গেলাম। কোন সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা পা বেড়িয়ে থাকতে সেদিকে দৌড়ে গিয়ে দেখি দীপ্তদা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। পাশে খোলা ক্যামেরার ব্যাগ। যদিও ক্যামেরাটার কিছু হয়নি। আমরা তাড়াতাড়ি ধরে তুলতেই 'আঃ উঃ' করে নিজেই উঠে বসল।

"কি কান্ড! কি করে হল এরকম?" সুমন্ত্রবাবু বললেন।

"জানিনা। দিব্যি ফোটো তুলছিলাম, হঠাৎ মাথার পিছনে পাথরের বাড়ি। ব্যাস। অন্ধকার সব। চোর-ছ্যাঁচোড়ের কাজ হবে," ক্যামেরাটাকে সযত্নে পরীক্ষা করতে করতে বলল।

"যেতে পারবে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

এক ঝটকায় উঠে পড়ে বলে, "হ্যাঁ রে। লেগেছে তো মাথায়। পায়ে তো কিছু হয়নি।" তারপর সুমন্ত্রবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "একটা রিকোয়েস্ট। এই ঘটনার কথা যেন আর কাউকে বলবেন না। বলবেন ক্যামেরা নিয়ে এত মগ্ন ছিলাম, তাই ফেরার কথা খেয়াল ছিলনা। প্লিজ, কোন প্রশ্ন করবেন না। যথাসময় সব জানতে পারবেন।"

সুমন্ত্রবাবু বোকার মত ঘাড় নাড়েন।

গাড়িতে ফেরার পর ওই উত্তর-ই দেওয়া হল। ড্রাইভার একটু বিরক্তি দেখিয়ে বলল, এর চেয়ে আরো অনেক ভালো জায়গা সামনে আছে।

পাইকারা ফল্‌স্‌টা সত্যি ছবির মত। এত সুন্দর জায়গা তা লিখে বোঝানোর মত সাধ্যি নেই আমার। এবার আর দীপ্তদা কে একা ছাড়িনি। সাথে সাথে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনেকটা নীচে নেমে গেলাম দুজনে। দারুন সব পাখি আছে। আর দীপ্তদা বার্ড ফোটোগ্রাফি করতে খুব ভালোবাসে। আমি বললাম, "তোমার ক্যামেরা ঠিক আছে তো?"

ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ দিয়ে একতা উড়ন্ত পাখিকে ট্র্যাক করতে করতে বলল, "ক্যামেরা তো ঠিক আছে। কিন্তু বুঝতে পারছিনা একটা জিনিস। চোর ক্যামেরা না নিয়ে ভিতর থেকে মেমরি কার্ড খুলে নিয়ে গেল কেন?"

"মানে?"

"মানে, ক্যামেরা ঠিক আছে। কিন্তু মেমরি কার্ড নেই। স্টেপনি মেমরি কার্ড দিয়ে চালাচ্ছি। ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে রে পটলা।" এরকম ব্যাপার শুনে আমিও এত তাজ্জব বনে গেছি যে, 'পটলা' শুনে রাগ হলনা।

"তাহলে সকাল থেকে যে ছবিগুলো তুললে?"

"সব গেছে।" ব্যাস্‌। আর কিছু না বলে স্পিকটি নট হয়ে ছবি তুলতে লাগল। আমি দু-একবার কথা বলতে গিয়ে ধমক খেলাম। বলল, "চুপ্‌, এত কথা বললে পাখি উড়ে যাবে।"

ফেরার সময় দীপ্তদার ভ্রূ দুটো দেখলাম সাংঘাতিক রকম কুঁচকে রয়েছে। আর কিছু বলার বা জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। গাড়ি থেকে বাকি সবাই মার্কেটের কাছে নেমে গেল। কিছু কেনাকাটি করে পরে হোটেলে ফিরবে। শুধু আমরা দুজন, সুমন্ত্রবাবু আর হিরণ্ময়বাবু হোটেলে ফিরলাম।

ঘরে ফিরে সব ছবিগুলো আই-প্যাডে ট্রান্সফার করল দীপ্তদা। সত্যি অসাধারন ছবি তোলে। কিন্তু সকালের ফোটোগুলো হারিয়ে গেল বলে মনটা খারাপ লাগছিল। যাই হোক, গরম জলে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। দীপ্তদাও স্নান করতে ঢুকবে এমন সময় দরজায় নক শুনে দরজা খুলে দেখি সুমন্ত্রবাবু।

"কি সমস্যায় পড়েছি বলুন তো!" সুমন্ত্রবাবু বললেন।

"আসুন। কেন কি হল?" দীপ্তদা বলে।

"প্রথমত, হিরণ্ময়বাবু পাইন বনে পড়ে গিয়ে রুমের চাবি হারিয়ে ফেলেছেন। রুমে ওই দামী জিনিসটা আছে বলে রুমের কি রিসেপশনে না দিয়ে সঙ্গে নিয়েই গেছিলেন। কোথায় পড়ে গেছে পকেট থেকে। দ্বিতীয়ত, শুভ্রাংশুবাবু এখুনি ফিরেছেন। ফিরেই ফোন এসেছে যে ওনার নাকি মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আইসিইউতে রয়েছেন। তাই কাল সকালেই ফিরে যাবেন। এবার বাকি টাকা ফেরত চাইছেন। এরকম হয়, বলুন? সব বুকিং করা।"

"হুম্। তা সেটা তো একটা সমস্যা। আপনি নাহয় একটা কাজ করুন। ওনাকে বলুন, উনি ফিরে যান। আপনি তো পালিয়ে যাচ্ছেনা না। কোলকাতায় আপনার অফিসে আসতে বলুন, তখন না হয়..." দীপ্তদা চট্‌জলদি সাজেশন্ দেয়।

"ধুর্, সে চেষ্টা কি করিনি ভাবছেন? কিছুই শুনছেননা। আচ্ছা, দেখি কি করা যায়। আপনার শরীর ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ফিট।" দীপ্তদা হেসে বলে।

"গুড। চলি তাহলে। নটায় খেতে নামুন।"

"ঠিক আছে।"

"ও ভালো কথা", ভদ্রলোক যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, "আর একজন বাঙালি এসেছেন হোটেলে। একটু আগে হোটেলের বুকিং রেজিস্টারে দেখলাম। আমাদের দুদিন বুকিং ছিল। সেটা এক্সটেন্ড করাতে গেছিলাম। তখন দেখলাম। দিবাকর রায়। অ্যারাইভড্ ফ্রম মুম্বাই। চলি।" ভদ্রলোক নিজের ঘরের দিকে চলে যান। সত্যি, এই একার হাতে সব সামলানো খুব ঝক্কির জিনিস। দীপ্তদাও তাই বলল।

রাতে নটার সময় খেতে নেমে দেখি কেউই প্রায় আসেনি। সুমন্ত্রবাবু বললেন সবাই নাকি এত টায়ার্ড, তাই যে যার রুমে খাবার আনিয়ে নিয়েছেন। আমরা তিনজনে খাওয়া শুরু করলাম। এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে কোণার টেবিলে বসলেন। মুখে একগাল চাপ দাড়ি, চোখে বেশ পুরু ফ্রেমের চশমা, আর বাঁগালের ওপর বেশ বড়সড় একটা আঁচিল। বসে বেশ চোস্ত কায়দার ইংরাজিতে খাবার অর্ডার করলেন। বুঝলাম ইনিই হলেন দিবাকর রায়। কারণ হোটেলে আর কোন বোর্ডার নেই। দীপ্তদা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "কোলকাত্তাইয়া বাঙ্গালির মুখে এত ভালো অ্যাকসেন্ট শোনা যায়না। মনে হচ্ছে মুম্বইএই বর্ন এন্ড ব্রট আপ।"

এদিন রাতে বেশ ঘুম হল। সুমন্ত্রবাবু শেষ অব্ধি কোলকাতার চেনা এজেন্টকে দিয়ে শুভ্রাংশুবাবুর ফ্লাইটের টিকিট কাটিয়ে দিয়ে রক্ষা পেয়েছেন। দুপুরে কোয়েমবাটোর থেকে ফ্লাইট। তাই ভোর না হতেই ভদ্রলোক চেক আউট করবেন। রাতে এসে গুডবাই জানিয়ে গেলেন। দীপ্তদা বলল, "খেতে এলেন না যে?"

"আর মশাই এরকম একটা খবর শোনার পর আর মনের অবস্থা ভালো নেই। তারওপর সব রিপ্যাক করার ছিল। তাই ঘরেই আনিয়ে নিলাম। চলি। আর আপনি ওই জমির দামটা জিজ্ঞেস করতে ভুলবেননা। কোলকাতায় গিয়ে দেখা হবে নিশ্চয়ই।"

"আশা করি।" দীপ্তদা বলে।

সকালে আবার ওরকম বিটকেল একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম-টুম ভেঙ্গে গেল। আজ আমাদের কুন্নুরের দিকে যাওয়ার কথা। একসাথেই যাওয়া হবে সবাই মিলে। শুভ্রাংশুবাবু বেরিয়ে গেছেন অনেক ভোরে। তাই আমরা এখন ন'জন। কুন্নুরের দিকটাও বেশ সুন্দর। একটা চা বাগান দেখা হল। মা-বাবার জন্য দীপ্তদা এক প্যাকেট চা কিনে দিল। নিজেও নিল একটা। তারপর ডলফিন নোজ, সুইসাইড পয়েন্ট এইসব ঘুরতে বেশ লাগল। কাল লেক দেখেছিলাম। আজ দেখলাম মালভুমি পাহাড়। বেশ অন্যরকম ফিলিংস। দীপ্তদা প্রচুর ছবি তুলল। আজ ছোট একটা লেন্স লাগিয়েছে দেখলাম। দেড় ফুটিয়া লেন্সটা ব্যাগে নিশ্চয়ই। দুপুরে দোকান পাওয়া যাবে বলে আজ আর খাবার প্যাক করা হয়নি। একটা ছোট্ট দোকানে বেশ গরম গরম ভাত, সম্বর, পাঁপড়ভাজা, বাঁধাকপি খেতে খারাপ লাগলনা। একটু টক টক, কিন্তু বেশ সুস্বাদু।

বিকেলে ফেরার পথে শহরের ভিতরে একটা ছোট বোটানিকাল গার্ডেন আছে। সেখানে যাওয়া হল। বেশ ভালো লাগল আমার। অর্কিড হাউসের অর্কিডের ছবি তুলল দীপ্তদা ওই দেড়-ফুটিয়া দিয়ে। ক্যামেরার ডিসপ্লেতে দেখেই ব্যোমকে গেলাম পুরো। বাকিরা গাড়ি করে ফিরে গেল হোটেলে। আমরা দুজন মার্কেটের কাছে নেমে গেলাম। দীপ্তদার নাকি সেভিং ক্রিম ফুরিয়ে গেছে।

ফেরার সময় আবার হাঁটা ধরলাম আমরা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। আসতে আসতে শহরের আলোগুলো সব জ্বলে উঠছে। বেশ দেখতে লাগে। হোটেলে এসে সারাদিন জার্নির ক্লান্তিতে কোনরকমে খেয়ে নিয়ে বিছানায় পড়েই তলিয়ে গেলাম ঘুমে।

সকালে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলোনা। ভাঙলো দীপ্তদার ঝাঁকানিতে।

"কি হল?" ধড়মড় করে উঠে বসে বলি।

"খুন। হিরণ্ময়বাবু খুন হয়েছেন নিজের ঘরে।"

এর ঠিক রিঅ্যাকশন কি দেওয়া উচিত বুঝতে পারলাম না। বোকার মত মুখ হাঁ করে চেয়ে রইলাম। দীপ্তদা বলল, "বোকার মত না তাকিয়ে থেকে শিগগির গিয়ে মুখ ধুয়ে নে। পুলিশ আসছে।" জীবনে কখন এরকম অবস্থায় পড়িনি। একেবারে খুন! স্কুলের বন্ধুদের গিয়ে বললে সবার একেবারে রোম খাড়া হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এসে দেখি সবাই ভীড় করেছেন রুমের আশেপাশে। দীপ্তদা আমায় ভিতরে যেতে বারণ করল। সুমন্ত্রবাবু তো মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। মৃন্ময়বাবু পুলিশে ফোন করেছেন।

মিসেস দেব তো মিঃ দেবের জামা খামচে ধরে ফ্যাকাশে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। মিঃ দেবকে খালি বলছেন, "তুমি একদম ওদিকে যাবেনা বলে দিচ্ছি।"

পুলিশ এসে ভিতরে ঢুকে সব দেখতে শুরু করল। ইন্সপেক্টর মিঃ স্বামীনাথন এসে সুমন্ত্রবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। সকালে বেড টী দিতে এসে বেয়ারা দেখে যে দরজা খুলছেন না হিরণ্ময়বাবু। ভেবেছে ঘুমাচ্ছে। পরে আবার আসে। কিন্তু অনেক ধাক্কাধাক্কির পরও যখন খোলেননি দরজা, তখন মৃণ্ময়বাবু আর সোমকবাবুকে খবর দেয়। ঘর লকড্ ছিলো না। খোলার পর দেখা যায় এই অবস্থা। বিছানার ওপর পড়ে আছেন। সে এক রক্তারক্তি ব্যাপার। কেউ ভারী কিছু দিয়ে মাথায় মেরেছে। মার্ডার ওয়েপন কোথাও নেই। জানলা টপকে জোরে ছুঁড়ে দিলেই হল। একেবারে লেকের জলে। মৃণ্ময়বাবু তখুনি পুলিশকে ফোন করেন।পুলিশের ডাক্তার বললেন রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে হয়েছে ঘটনাটা। হোটেলের দরজা রাত এগারোটার পর বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং বাইরের থেকে এসে যে কেউ খুন করবে, সেটাও সম্ভব নয়। খুনি ভিতরের কেউ।

মিঃ স্বামীনাথন সবাইকে জেরা করবেন বললেন। সুমন্ত্রবাবু ওনাদের দলের সবাইএর নাম বললেন। মিঃ স্বামীনাথন তারপর দীপ্তদার কাছে এসে বলেন, “আপনি কে?”

দীপ্তদা ওকে বললেন যে আমরা বেড়াতে এসেছি আলাদা। এখানে এসে ওনাদের সাথে দেখা হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ কি মনে করে বলে বসল, “কিছু মনে করবেন না, আমি এই ব্যাপারটা তদন্ত করতে চাই। আপনি আপনার কাজ চালান। এদিকে আমি নিজে একটু উৎসাহী। তদন্তের ব্যাপারে।”

এরকম একটা প্রস্তাব শুনে স্বামীনাথন প্রথমে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, “আপনাকে দিয়েই তো তাহলে জেরা শুরু করতে হয় দেখছি। প্রাইভেট গোয়েন্দা নাকি? শার্লক হোমস্? থানায় তুলে নিয়ে গেলে সব শখ মিটে যাবে, বুঝেছেন?”

দীপ্তদা ততক্ষণে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ফেলেছে। ওর পকেটে আই-কার্ডও থাকে দেখে আমি থ হয়ে গেলাম। এরকম তো সিনেমায় দেখি। স্বামীনাথন দীপ্তদার আই-কার্ড দেখে আবার অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালেন। তারপর হাতের লাঠিটা বগলে নিয়ে খটাস্ করে একটা স্যালুট ঠুকে বললেন, “সরি, স্যর। মানে, বুঝতে পারিনি।” ওনার মুখটা দেখে আমার খুব হাসি পেয়ে গেল। বাকিদেরও তথৈবচ অবস্থা। সুমন্ত্রবাবু তো এসে মাথা-টাথা চুলকে বললেন, “কে দাদা আপনি?”

দীপ্তদা মুচকি হেসে বলল, “সরকারি চাকুরে।” পরের মুহুর্তেই গম্ভীর ভাবে স্বামীনাথনকে বলল, “আপনি যা যা জেরা করার করে নিন। তারপর আমি করব। ততক্ষণ ঘরটা একবার দেখব। চিন্তা নেই কোন জিনিস ডিসপ্লেস করবনা।”

দীপ্তদা অনেকক্ষণ ধরে হামাগুড়ি দিয়ে, হাঁটু গেড়ে, মেঝেতে শুয়ে পড়ে ঘরটা দেখল। তারপর হিরণ্ময়বাবুর জিনিসপত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ মৃণ্ময়বাবুকে প্রশ্ন করলেন, “সেই ব্র্যাডম্যানের বেলটা কোথায় থাকত?”

মৃণ্ময়বাবু বললেন, “আমি তো ঠিক জানিনা। তবে, যতদূর জানি ওই হ্যান্ডব্যাগের মধ্যেই।” দীপ্তদা হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে সেটার চেন খোলার আগে ভালো করে উপরটা পরীক্ষা করে। হঠাৎ কিছু একটা ছোট্ট জিনিস লেগে থাকতে দেখে, নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরলো। আমি এত দূর থেকে বুঝলাম না ওটা কি। তারপর ভিতরের সব জিনিস ঘরের এক কোণে সব ঢেলে ফেলে বলল,“সব আছে। কিন্তু বেল নেই।”

ঘরের সব জিনিস খুঁজেও বেল পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে পুলিশের জেরা শেষ। যতক্ষণ তদন্ত চলছে, কাউকে হোটেল ছেড়ে বেরোতে দেওয়া হবে না। দিবাকরবাবু একটু আগে পাইকারা যাওয়ার জন্য বেরোচ্ছিলেন। ওনাকেও আটকে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে যে যার ঘরে থাকতে বলে মিঃ স্বামীনাথন দীপ্তদাকে ‘প্লিজ্ প্রোসিড’ বলে চলে ঘরটা লক করে দুজন পুলিশ পোস্ট করে গেলেন। যাওয়ার আগে দীপ্তদার ফোন নাম্বার নিয়ে গেলেন, আর চায়ের নেমন্তন্ন করে গেলেন।

দীপ্তদা আমাকে বলল, “যা তো ঘরে গিয়ে আমার আই-প্যাডটা আর নোটবুকটা নিয়ে আয়। তুই আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।” আগে এরকম বললে খুব রাগ করতাম হয়তো, কিন্তু একজন ইন্সপেক্টর এত খাতির করল দেখে বেশ গর্ব হচ্ছিল। তাই বেশ থ্রিল নিয়ে দীপ্তদার আদেশ পালন করতে ছুটলাম। এসে দেখলাম দীপ্তদা ম্যানেজারকে বলে একটা খালি ঘর খুলিয়ে তার মধ্যে একটা চেয়ার নিয়ে বসেছে। সুমন্ত্রবাবুকে বলল, “আপনার সাথে কথা বলে প্রথমে ছেড়ে দিই।” সুমন্ত্রবাবু “নিশ্চয়ই” বলে সামনের চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লেন। আমি গিয়ে দরজাটা আটকে দিলাম।

দীপ্তদা নোটবুকটা সুমন্ত্রবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “আপনার পুরো নাম, ঠিকানা আর কি করেন লিখে দিন তো।” সুমন্ত্রবাবু লিখে খাতা-পেন ফেরত দেন। দীপ্তদা চোখ বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করেন, “আপনার ব্যবসা কিসের?”

“ওই ইলেকট্রনিক্স গুডসের। সাপ্লাই দিই বিভিন্ন দোকানে।”

“কেমন চলে?”

"ভালোই। ওই এলাকায় মনোপলি বলতে পারেন"।

"এলাকা বলতে?"

"আমার বাড়ির এলাকা। শ্যামবাজার। ওখানেই আমার অফিস-কাম-দোকান।"

"আচ্ছা, হিরণ্ময়বাবুর সাথে কিভাবে পরিচয়?"

"আর পাঁচজন কাস্টমারের সাথে যেভাবে হয়। আমি অ্যাড দিয়েছিলাম কাগজে। উনি দেখে প্রথমে ফোনে যোগাযোগ করেন, পরে এসে টাকা জমা দিয়ে যান।"

"আর বাকিরা? একই রকম ভাবে?"

"বাকিরা বলতে হিরণ্ময়বাবু ওনার, ওনার ছেলে আর তার সোমকবাবুর টাকা জমা দিয়ে যান। আলাপনবাবুর কাগজেই আমার অ্যাড বেরোয়। আমি যখন অ্যাড জমা করতে গেছিলাম। তখনই উনি ধরেন আমাকে।"

"এক মিনিট। উনি তো সাংবাদিক। আপনি নিশ্চয়ই কোন সাংবাদিকের কাছে বিজ্ঞাপন জমা দেননি।"

"উনি তো সাংবাদিক নন। উনি কাগজের অফিসে চাকরি করেন। অ্যাড সেকশনে।"

"স্ট্রেঞ্জ। তারপর বলুন।"

"বাকিদের মধ্যে, সবাই ওই অ্যাড দেখে ফোন, তারপর এসে টাকা জমা দিয়ে যাওয়া।"

"ওকে। ঠিক আছে, আপনি এবার আসতে পারেন। আপনি প্লিজ, মৃণ্ময়বাবুকে পাঠিয়ে দিন" দীপ্তদা বলে।

"নিশ্চয়ই" বলে সুমন্ত্রবাবু চলে যান।

মৃণ্ময়বাবুকে দৃশ্যতই খুব ধ্বস্ত লাগছে। স্বাভাবিক। ভদ্রলোককে দেখে আমার খুব খারাপ লাগল। ওনাকে দিয়েও দীপ্তদা নাম ইত্যাদি লিখিয়ে নিল। তারপর বলল,

"দেখুন, আমি খুব দুঃখিত। আপনাকে এভাবে জেরা করতে হচ্ছে।"

"না না, ঠিক আছে, বলুন।"

"আপনি লিখেছেন যে ম্যাকিনটোশ এন্ড সন্স-এর সেলসে আছেন। কোম্পানি কিরকম চলে?"

"পুরোনো কোম্পানি। খুব ভালো নয়। তাই অন্য কোথাও জব খুঁজছিলাম।"

"আচ্ছা। আপনার মা..."

"মা মারা গেছেন। দু'বছর হল। আমি আর বাবা থাকি বাড়িতে, সরি, থাকতাম।"

"ওহ্। সোমকবাবু আপনার কিরকম বন্ধু?"

"ও আগে আমার কোম্পানিতেই ছিল। তখনই বন্ধুত্ব। পরে কিছু প্রবলেম হওয়ায় ও কোম্পানি ছেড়ে দেয়। দিয়ে অন্য কোম্পানিতে যোগ দেয়।"

"আপনার পড়াশোনা?"

"আমি বিকম পাশ করি। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে।"

"আপনার সাথে আপনার বাবার সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"ভালো। মা মারা যাওয়ার পর আমিই বাবার একমাত্র সম্বল ছিলাম।"

"আপনি জানেন, আপনার বাবার খেলোয়াড় জীবনে একটা খুব দুঃখজনক ঘটনা আছে?"

"হ্যাঁ। শীর্ষেন্দু বাগচী। বাংলার টিমে ঢোকার জন্য বাবার কম্পিটিটর ছিলেন। কিন্তু তার আগেই..."

"সেটা নিয়ে আপনার বাবার মনে কোনরকম আফশোস ছিল?"

"আফশোস ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু অনেকবার বলতেন। যদিও এও বলতেন যে অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। তাতে তো কারো হাত নেই।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে। আপনি আসুন। সোমকবাবুকে ডেকে দিন, প্লিজ।"

সোমকবাবুকে দেখে যথারীতি কিছু বোঝার উপায় নেই যে কিছু ঘটে গেছে। একটা নির্লিপ্ত মুখ নিয়ে এসে চেয়ারে বসেন। দীপ্তদা প্রশ্ন শুরু করার আগেই ভদ্রলোক বলেন, "আমি নিশ্চয়ই আপনার সব কথার জবাব দিতে বাধ্য নই। পুলিশকে আমি যা বলার বলেছি।"

"আপনি এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই বাধ্য নন। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে হতেও পারেন।"

"পরবর্তী ক্ষেত্রে মানে? আপনি কি বলতে চান, আমি খুন করেছি?"

"কেউ সন্দেহের উর্ধে নয়। আপনি যদি আমার কয়েকটা সহজ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাহায্য করেন, তাহলে তদন্তের সুবিধা হবে।"

"বলুন"

"আপনি লিখেছেন যে আপনি এখন সি জি এস এফ নামের একটি কোম্পানিতে আছেন। এখানে আপনার কাজ কি?"

"আমি একজন আর্কিটেক্ট।"

"ওহ্। কোথা থেকে পাশ করেছেন?"

"যাদবপুর। নাইন্টিটু।"

"আপনি ম্যাকিন্টোশ ছাড়লেন কেন?"

"মৃণ্ময় বলেছে?" একটু থেমে বললেন, "ওখানে একটা ব্যাপারে আমায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। বদনাম থেকে বাঁচার জন্য আমি কোম্পানি ছাড়ি।"

"কি ব্যাপার?"

"সেটা আমি বলতে বাধ্য নই"

"বেশ, আমার শেষ প্রশ্ন, হিরণ্ময়বাবুর সাথে আপনার কতটা ইন্টার‍্যাকশন ছিল?"

"ছেলের বন্ধু হিসাবে যতটা হয়। কয়েকবার ওদের বাড়ি গেছি। বেশিরভাগ সময়ই ক্রিকেটের গল্প। ব্যাস্। এটুকুই"।

"ঠিক আছে, আপনি আসুন। আলাপনবাবুকে পাঠিয়ে দিন।" দীপ্তদার বাড়ানো হাতে হ্যান্ডশেক করে সোমকবাবু বেরিয়ে যান।

সোমকবাবু বেরিয়ে যেতে দীপ্তদা আমায় বলল, আস্টেরিক্স, দুটো কফি বলতো। তোর আর আমার। বক্‌বক্ করে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।"

আমি দৌড়ে গিয়ে কফি বলে ঘরে ফিরে দেখি আলাপনবাবু এসে বসেছেন। দীপ্তদা বলছে, "হিরণ্ময়বাবুর সম্পর্কে খবর তো রাখেন, কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল?"

"নাহ্। বলেছি তো সাংবাদিক হলে সবরকম খবর রাখতে হয়।"

"কিন্তু আপনি তো সাংবাদিক নন, আলাপনবাবু। আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেকশনে কাজ করেন। তাই নয় কি?" দীপ্তদা সরাসরি বলে।

আলাপনবাবু একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, মানে খবরের কাগজে তো। তাই আর কি।"

দীপ্তদা হেসে বলে, " খবরের কাগজের অফিসের সবাই তো সাংবাদিক হয় না আলাপনবাবু।"

আলাপনবাবু মাথা নিচু করে বসে থাকে। দীপ্তদা বলে, “আপনি তো চায়ে চিনি খান না। ডায়েবেটিক। তাহলে রাতে নিশ্চয়ই অনেকবার ওঠেন। সেদিন রাতে কিছু শোনেননি? আপনার ঘর তো হিরণ্ময়বাবুর ঠিক মুখোমুখি।”

“নাহ্। কোন শব্দ শুনিনি।”

“বেশ। আপনি এবার আসতে পারেন।”

ইনি হ্যান্ডশেক করে যাওয়ার পর দীপ্তদা মুখ বেঁকিয়ে আমায় বলল,“সদ্য নখ কেটেছে রে। হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে হাত ছড়ে গেল।”

এরপর দেব দম্পতি এসে প্রায় ঝড় বইয়ে দিলেন। মিসেস দেব তো কেঁদেকেটে একসা। বিয়ের পর এই ওদের এতদূর ঘুরতে আসা। শাশুড়ি কি বলেছেন, বড় ননদের মেয়ে কেন উটি আসতে বারণ করেছিল, সে এখন ইউকেতে আছে। সব কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর দীপ্তদা যেতে বললে নিজেদের কপাল আর সুমন্ত্রবাবুর দোষ দিতে দিতে আমাদের পরিত্রাণ দিয়ে ঘর ছাড়লেন।

দিবাকরবাবু ঘরের মধ্যেও টুপি, মাফলার পরে থাকেন দেখলাম। আগেও দুবার টুপি, মাফলার পরাই দেখেছি। বললেন ঠান্ডার ধাত। খুললেই ঠান্ডা লেগে যাবে। দীপ্তদার নোটবুক ফিল-আপ করে দেওয়ার পর বললেন, “আমাকে কেন আপনারা জেরা করছেন, বলুন তো? আমি আপনাদের চিনিই না। এলাম বেড়াতে। সারাদিনের বেড়ানোটা মাটি করলেন”। দৃশ্যতই খুব বিরক্ত ভদ্রলোক।

দীপ্তদা খুব শান্তভাবে বলল, “দেখুন, একটা মিস্‌হ্যাপ হয়েছে, আমাদের হাতে তো কিছু নেই। সুতরাং, মনে করুন এই হোটেলে থাকার ‘অপরাধ’ হিসাবে এই একটু দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আপনাকে কিছু তেমন জিজ্ঞাস্য নেই আমার। শুধু ছোট ছোট দুটি প্রশ্ন করে ছেড়ে দেব।”

“বেশ বলুন”

“আপনার বাড়ি মুম্বইতে বললেন তো?”

“হ্যাঁ।”

“এখানে পরশু এসেছেন। কিসে এলেন?”

“ফ্লাইটে চেন্নাই। দেন বাই কার।”

“ওকে। গুড। আপনি পেশা লিখেছেন টিচার। কি পড়ান?”

“বায়োলজি।”

“ওকে। ফিরছেন কবে?”

“আমার পরশু দুপুরের ফ্লাইট আছে। তাই কাল রাতেই বেরোনোর কথা এখান থেকে। কিন্তু এ যা হল। কিছু তো বুঝতেই পারছিনা।”

“চিন্তা করবেন না। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেসটা সল্‌ভ করার চেষ্টা করছি। কারণ ফেরার তাড়া আমারও আছে কি না।”

“দেখুন হলেই ভালো।”

“ঠিক আছে। আপনি আসুন। আবার দরকার হলে একটু বিরক্ত করব।” বলে দীপ্তদা হাত বাড়িয়ে দেয় হ্যান্ড শেক করার জন্য। ভদ্রলোক হ্যান্ডশেক করে চলে গেলেন। দীপ্তদার দেখলাম ভুরুটা সাংঘাতিক রকম কুঁচকে গেছে। আমি নোটবুকটা তুলে উলটে পালটে দেখতে থাকলাম।

ঘরে এসেও দীপ্তদা চুপ করে বসে রইল। আর আইপ্যাড আর ওই নোটবুকটা খুলে কিসব দেখতে লাগল। আমি যা গোয়েন্দা গল্প-টল্প পড়েছি, তা থেকে জানি যে এই সময় বিরক্ত করতে নেই গোয়েন্দাদের। তাই চুপচাপ বসে সাথে নিয়ে আসা গোরস্থানে সাবধান পড়তে লাগলাম। একটু পরে দীপ্তদা বলল, "চল, লাঞ্চ করে আসি।" খিদেও পাচ্ছিল বেশ। লাঞ্চের জন্য নীচে নেমে দীপ্তদা দেখলাম ডাইনিং হলের দিকে না গিয়ে সুমন্ত্রবাবুর দরজায় নক্ করল। ভদ্রলোক বেরোতেই বলল, "আপনি কাল শুভ্রাংশুবাবুর ফেরার টিকেট যার কাছ থেকে করে দিয়েছিলেন, তার ফোন নাম্বারটা দেবেন? আমারও একটা টিকেট করতে হবে।"

দীপ্তদা আবার কোথায় যাবে? আমি খুব অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম। সুমন্ত্রবাবু 'নিশ্চয়ই' বলে মোবাইল থেকে নাম্বারটা দীপ্তদাকে দেন। দীপ্তদা নিজের মোবাইলে টুকে নিয়ে বলল, "খেতে যাবেন না?"

"একটু পরে। আপনারা সেরে নিন।"

"ঠিক আছে।"

আমি খেতে বসে জিজ্ঞেস করলাম, "এজেন্টের ফোন নাম্বার নিয়ে কি করবে? কোথায় যাবে? আমাদের টিকেট তো করাই আছে।"

"উত্তর মেরু" বলে আবার চুপ করে গেল।

খাওয়ার পর ঘরে ঢোকার মুখে দীপ্তদা আমায় বলল, "শোন পটলা, লেকের ধার থেকে একবার চক্কর মেরে আয়। আমি এখন ভাবব। তুই থাকলেই খালি বক্‌বক্ করবি।"

"কিন্তু হোটেলের বাইরে বেরোনো তো বারণ!" আমি বললাম।

"তোর জন্য নয়।" বলে ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দিল। খুব রাগ হল। ধুর, নিজে একটা আই-কার্ড আছে বলে খুব হিরোগিরি দেখাচ্ছে। আমারও একদিন হবে। তখন আমিও ওকে বের করে দেব রুম থেকে। এরকম একটা জোরদার শপথ গ্রহণ করে নিচে নেমে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, সত্যি পুলিশ দুজন আমায় কিছু বলল না। দীপ্তদা বলে রেখেছে মনে হয়। যাই হোক, আমি সাত পাঁচ না ভেবে লেকের পাড়ের দিকে এগোলাম। লেকে বোটিং হয়। তবে তার টিকেট কাউন্টার বা ঢোকার গেট, সেগুলো অন্যদিকে। এখানটা তাই বেশ ফাঁকা। নিরিবিলি। আমি লেকের ধারে গিয়ে বসে ভাবতে লাগলাম কেসটা নিয়ে। কে খুন করতে পারে। আমার আলাপনবাবুকেই সন্দেহ হল। লোকটা কেমন একটা। খালি হামবড়াই ভাব। আর নিজের সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলেন। তাই ওনাকেই কালপ্রিট ধরে নিয়ে কেসটা সাজাতে লাগলাম। কিন্তু খামোখা একট মানুষকে খুন কেন করতে যাবেন, এটা ঠিক ভেবে পেলাম না। অগত্যা হাল ছেড়ে দিলাম। যার কাজ সেই করুক। ছোটবেলায় বাড়ির পাশে একটা পুকুর ছিল। সেটায় ব্যাংবাজি করতাম। পরে পুকুরটা বুজিয়ে একটা মল হয়ে গেছে। এত বড় লেক দেখে সেই ব্যাংবাজি করার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু এখানে সব পাথর। ফেললেই টপাং করে ডুবে যাবে। চ্যাপ্টা ঢিল জাতীয় কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজি। এই ভেবে পড়ে থাকা একটা গাছের পাতা সরাতেই যে জিনিসটা দেখলাম, সেটা দেখে কয়েক সেকেন্ড কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে, তারপর হোটেলের দিকে দৌড়লাম দীপ্তদাকে খবর দিতে। একটা বড়সড় পাথর। তার গায়ে প্রায় শুকিয়ে আসা ভর্তি রক্তের দাগ।

দীপ্তদা মিঃ স্বামীনাথনকে ফোন করতে উনি একজন পুলিশ পাঠিয়ে ওই পাথরটা নিয়ে গেলেন। দীপ্তদা ফিঙ্গার প্রিন্ট টেস্ট করতে বলল। স্বামীনাথন বিকেলের মধ্যে করে জানাচ্ছেন বললেন। আর বিকেলে চায়ের নেমন্তন্নের ব্যাপারটা রিমাইন্ডার দিলেন।

দীপ্তদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি গো, কতদূর এগোলে?"

উত্তরে বলল, "অনেকদূর। প্রায় চেন্নাই অব্ধি। আর একটু গেলেই পৌঁছে যাব।"

এরকম হেঁয়ালি করার কি আছে বুঝিনা। আমি কি খুনি যে আমায় কিছু বলবে না! দাদা, না, শত্রু ভগবান জানে।

সন্ধ্যেবেলা মিঃ স্বামীনাথনের কোয়ার্টারে চায়ের সাথে টা-ও বেশ ভালো জমল। উনি এখানে একাই থাকেন। ফ্যামিলি থাকে চেন্নাইতে। "কেসটা নিয়ে কি ভাবছেন?"স্বামীনাথন জিজ্ঞেস করলেন।

"অনেকটাই ভেবেছি। একটা খটকা শুধু লেগে আছে। আশা করি, কাল সকালের মধ্যে সলভ্ করে ফেলব। শুধু আপনার একটা হেল্প চাই।"

"নিশ্চয়ই। বলুন কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"এখন নয়। আর একটু ভাবি। রাতে জানাচ্ছি।"

হোটেলে ফিরতে ফিরতে প্রায় আটটা বাজল। সন্ধ্যে বেলা যথেষ্ট খাওয়া হয়েছে। তাই আর ডিনার করলাম না। সিধে ঘরে গেলাম। মা ফোন করেছিল একটু আগে। এসব কিছু বলিনি। বললে আর দেখতে হবে না। বাবাকে পাগল করে দেবে চিন্তায় চিন্তায়। তাই যা বলার ফিরে গিয়েই বলব।

দীপ্তদা আবার আই-প্যাড খুলে বসে কিসব দেখছে। ফোন করল কয়েকটা। নীচু গলায় জানলার ধারে গিয়ে কথা বলল। কিছুই শুনতে পেলাম না। আমি হাল ছেড়ে দিয়ে 'পেরিগাল রিপিটার'এ মন দিলাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা। শুধু এটুকু মনে আছে, দীপ্তদা খাটে বসে স্বামীনাথনকে ফোন করে বলছে, যে সকাল থেকে গেট খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ উটির বাইরে যেতে পারবেনা। আর পুলিশ আউট পোস্টগুলোতে সবার ছবি সার্কুলেট করে দেওয়া হবে, যাতে কেউ বেরোতে গেলে ধরা পড়ে।

স্বপ্ন দেখলাম, আমি একটা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি। মাথার পিছনে একটা বড় আলো। সামনে দীপ্তদা হাতে শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে পায়চারি করছে, আর বলছে, "সবই তো হল কিন্তু সাত-দুকুনে কত হয় সেইটেই মনে পড়ছেনা।" আমি বলতে গেলাম 'চোদ্দ'। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না। দেখি মুখ বাঁধা। এমন সময় দেখি আলাপনবাবু একটা বেল নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তার গায়ে ব্র্যাডম্যানের সই করা। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে দীপ্তদাকে ডাকব, তাও পারছিনা। ভয়ের চোটে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু দীপ্তদা নেই ঘরে। ঘড়িতে দেখলাম পৌনে নটা। উঠে দেখলাম বাথরুমের দরজাও খোলা। তার মানে দীপ্তদা বাইরে কোথাও গেছে। বলে গেল না? বেজার মুখ করে দাঁতা মাজার জন্য ব্রাশটা নিতে যাব, দেখি একটা কাগজ রাখা পেস্টের পাশে। দীপ্তদা লিখেছে, "চট্‌পট্ রেডি হয়ে নে। ঠিক সাড়ে নটায় ব্রেকফাস্ট করে রেডি থাকবি। রুম লক করে নিচেই ওয়েট করিস। আমি ফিরে আসব।"

ব্রেকফাস্ট করে বাইরে বেরোতেই সুমন্ত্রবাবুর সাথে দেখা। আমাকে দেখেই বললেন, "এই যে, তোমার দাদা কোথায়?"

"সে তো জানিনা। বেরিয়ে গেছে অনেক সকালে। কেন?" আমি বলি।

"আমায় তো ভোরবেলা দরজা নক্ করে বলে গেলেন যে সবাইকে যেন নটার সময় ঠিক জানিয়ে দিই যে কেস্ সলভড্। সবাই বাইরে বেরোতে পারেন। কিন্তু উটির বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশে ধরবে। সবার ছবি নাকি দেওয়া আছে পুলিশ আউটপোস্টে। এখন দিবাকরবাবু তো দেখলাম পাইকারা যাওয়ার জন্য বেরোচ্ছেন। ভাবলাম তোমার দাদাকে ইনফর্ম করা দরকার।"

"ওহ্। ফোন করে দেখতে পারেন।"

"থাক। আসলেই বলব। দিবাকরবাবু তো আমাদের কেউ নন। ওনাকে আটকে রেখেই বা কি লাভ।"

"হ্যাঁ, সেই।" বলে আমি সামনের লাউঞ্জে গিয়ে বসি। সামনে টিভি চলছে। কোন স্থানীয় চ্যানেল। ভাষাটা শুনে এক বর্ণও বুঝছিনা। বেশ মজা লাগছে।

এমন সময় একটা পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াতেই দীপ্তদা নামল। "কি রে, রেডি?" আমায় দেখে বলল।

আমি বললাম, "হ্যাঁ। সুমন্ত্রবাবু তোমায় খুঁজছিলেন।"

"কেন রে?"

"সেরকম কিছু নয়। দিবাকরবাবু পাইকারা যাওয়ার জন্য বেরিয়েছেন, সেটা ইনফর্ম করার জন্য।"

"সর্বনাশ। এত তাড়াতাড়ি!" বলেই দৌড়ে রিসেপশনে গিয়ে কিসব জিজ্ঞেস করে। এর মধ্যে সুমন্ত্রবাবুও এসে পড়েছেন। দীপ্তদা ওনাকে দেখেই বলে, "যদি ক্লাইম্যাক্সে হাজির থাকতে চান। ইমেডিয়েটলি আমার সাথে চলুন।" বলেই আমার হাত ধরে টান দেয়।

সুমন্ত্রবাবুও আমাদের পিছন পিছন পুলিশের গাড়িতে ওঠে। স্বামীনাথন ছাড়া একজন কনেস্টবল আছেন গাড়িতে। দীপ্তদা সামনে বসে জিজ্ঞেস করে, "এখান থেকে কুন্নুরের দিকে নেমে যাওয়ার রাস্তা কি একটাই?"

স্বামীনাথন বলেন, "হ্যাঁ। পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তাটা একটাই। তবে সেই রাস্তায় পৌঁছানোর জন্য কয়েকটা রাস্তা আছে।"

"তাহলে শর্টেস্ট রাস্তাটা ধরুন। ব্লু স্যান্ট্রো। নাইন ওয়ান থ্রি নাইন। দিবাকরবাবুর গাড়ি। ধরতেই হবে।"

"কিন্তু উনি তো বললেন পাইকারা গেছেন।" সুমন্ত্রবাবু বলেন।

"না। আমার ইন্টুইশন বলছে, উনি চেন্নাই যাচ্ছেন। ঘর চেক করলে শিওর হওয়া যেত। কিন্তু এখন সময় নেই।"

গাড়ি ততক্ষণে তীব্রগতিতে ছুটেছে কুন্নুরের রাস্তার দিকে। আমি আর সুমন্ত্রবাবু কিছু না বুঝতে পেরে বোকার মত বসে আছি। সুমন্ত্রবাবু আবার বলেন, "কিন্তু মশাই চেকপোস্টে ধরা পরবে তো। আপনি এত ব্যস্ত কেন হচ্ছেন?"

দীপ্তদা খুব বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনাকে আনাই দেখি ভুল হয়েছে। বসে শুধু দেখুন। কোন কথা বলবেন না।" ধমক খেয়ে সুমন্ত্রবাবু চুপ করে যান। আমি একটু কাঁধ শ্রাগ করে বুঝিয়ে দিই যে আমিও সেই তিমিরে।

কুন্নুরের রাস্তায় পড়ার মুখেই একটা পুলিশ পোষ্ট আছে। সেখানে স্বামীনাথন জিজ্ঞেস করলেন যে কোন ব্লু স্যান্ট্রো গেছে কিনা। তারা বলল, "হ্যাঁ"। শুনে দীপ্তদা একটু মুচকি হাসল। নিজের ইন্টুইশন ঠিকঠাক সেটা প্রমাণ হওয়ার জন্য। ড্রাইভার পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ী ছোটালো। পাহাড়ের গা দিয়ে জিগ্‌জ্যাগ্ রাস্তা। খালি হেয়ারপিন বেন্ডস। তার মধ্যে দিয়েই বেশ জোরে আমাদের গাড়ি ছুটেছে। এক পাশে গভীর খাদ। পড়ে গেলে আর দেখতে হবেনা। সব কিছু বাঁচিয়ে গাড়ী ছুটছে। এভাবে মিনিট দশেক চলার পর নিচের রাস্তায় একটা ব্লু স্যান্ট্রো দেখা গেল। দীপ্তদা ড্রাইভারকে বলল, "ওই যে। ধরতে হবে।"

চেজ্ করে আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্যান্ট্রোর ঠিক পিছনে চলে এলাম। নাম্বার প্লেট দেখা যাচ্ছে। সেই গাড়িই। কিন্তু আমার মাথায় একটাই প্রশ্ন ঘুরছে, পুলিশ আটকালো না কেন, উটি ছাড়ার আগে?

স্যান্ট্রোর পিছন পিছন কিছুটা চলার পর একটা চওড়া জায়গা পেয়ে ড্রাইভার অসামান্য দক্ষতায় ওভারটেক করে আড়াআড়ি রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দীপ্তদা আর স্বামীনাথন লাফ দিয়ে নেমে গেছে। দীপ্তদা স্যান্ট্রোর জানলার কাছে গিয়ে বলল, "নেমে আসুন। আপনার খেল খতম।"

দরজা খুলে যিনি নেমে এলেন, তাঁকে দেখে আমার আর সুমন্ত্রবাবুর, দুজনেরই স্পেল-

বাউন্ড অবস্থা যাকে বলে, সেই দশা। শুভ্রাংশু সোম দাঁড়িয়ে আছেন।

ঠিক বারোটার সময় সবাইকে নিচের ডাইনিং হলে জমা হতে বলা হয়েছিল। দীপ্তদা রহস্য কিভাবে সলভ্ করল সেটা বলবে। বেশ এক্সাইটেড হয়ে গেছি। শুভ্রাংশু সোমকেও হাতকড়া পরিয়ে একটা চেয়ারে বসানো হয়েছে। পিছনে দুজন পুলিশ গার্ড দিচ্ছে।

সবাই এসে গেলে দীপ্তদা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল। সবার বোঝার জন্য সবটা ইংরাজিতেই বলল। আমি বাংলা করে লিখছি।

"আমি শুরু করব আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের একটা ঘটনা দিয়ে। ময়দানে সিলেকশন চলছে বাংলার দলের জন্য। খেলা চলছে কালিঘাট স্পোর্টিং আর মোহনবাগানের মধ্যে। কালিঘাটের হয়ে ব্যাট করছেন হিরণ্ময় চ্যাটার্জি। এবং মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন শীর্ষেন্দু বাগচী শর্টে ফিল্ডিং করছেন। এই দুজনের মধ্যেই বাংলার দলে ঢোকার জন্য রেষারেষি। এমন সময় একটা বল সুইপ করে মারতে গিয়ে সেটা লাগে শীর্ষেন্দুবাবুর মাথার পিছনে। এবং সেখানে তিনি সাথে সাথে মারা যান। এর ফলে হিনণ্ময়বাবু সরাসরি বাংলার দলে জায়গা করে নেন। একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারের মৃত্যুতে ক্রিকেট জগৎ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হল, সেটা নিয়ে খুব জল্পনা চললেও যেটা নিয়ে কোন কথা হয়না, সেটা হল মৃতের পরিবার। শীর্ষেন্দু বাগচীর একমাত্র ছেলে সেদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন। এবং চোখের সামনে বাবার মৃত্যু এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর হাসতে হাসতে সিলেক্টেড হয়ে মাঠ ছাড়া দেখে তার মনের অবস্থাটা যেরকম হয় সেটা খুবই সাংঘাতিক। বাবার 'হত্যাকারী' হিসাবে তার মনের মধ্যে হিরণ্ময় চ্যাটার্জীর নাম স্থায়ী হয়ে যায়। সেই ছেলের নাম অর্ধেন্দু বাগচী, ওরফে শুভ্রাংশু সোম, ওরফে দিবাকর দে। সোম টা তো আপনার মামাবাড়ির পদবী, তাই না অর্ধেন্দুবাবু?"

শুভ্রাংশুবাবু মাথা নাড়েন। সুমন্ত্রবাবু বলেন, "কিন্তু দিবাকরবাবু সেজে উনি কিভাবে আগের দিন রাতে এলেন? তখনো তো শুভ্রাংশুবাবু যাননি!"

"ধৈর্যং রহু।" দীপ্তদা বলে, "অর্ধেন্দুবাবু মামাবাড়িতে মানুষ হন। পড়াশোনাতে সম্ভবতঃ মেধাবি ছিলেন তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্কিটেকচার নিয়ে পাশ করেন নাইন্টি টুতে অর্থাৎ ঠিক যেবছর সোমকবাবুও পাশ করেন। সোমকবাবু আমায় তাঁর কোয়ালিফিকেশন বলতে গিয়ে বলেন যে উনি ওই বছর যাদবপুর থেকে পাশ করেন। আমি আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের থ্রুতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাইন্টিটুর স্টুডেন্ট লিস্ট পাই। সেখানে চোখ বোলাতে গিয়ে সোমকবাবু ছাড়াও অর্ধেন্দু বাগচীর নাম পাই। বাগচী পদবী হওয়ায় শুধুমাত্র নিছক সন্দেহের বশে আমি আরো খোঁজ নিতে বলি। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পাই যে ইনি শীর্ষেন্দু বাগচীর ছেলে।" দীপ্তদা একটু থামে। তারপর আবার বলতে শুরু করে, "সোমকবাবু ম্যাকিনটোশ ছেড়ে সিজিএসএফে যোগ দেওয়ার পর দেখেন যে অর্ধেন্দু বাগচী ওই একই কোম্পানিতে কাজ করছেন। সম্ভবতঃ, বেশ কয়েক বছর পর দুজনের দেখা হয়। সোমকবাবু, আমি যদি কিছু ভুল বলি, নিশ্চয়ই শুধরে দেবেন। কারণ এগুলো আমার অনুসন্ধানের ওপর নির্ভর করে করা অনুমান।" সোমকবাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেন। দীপ্তদা বলতে থাকে, "মৃণ্ময়বাবুর সাথে সখ্যতা এবং একসাথে এই বেড়াতে আসার কথা সোমকবাবুই নিশ্চয়ই অর্ধেন্দুবাবুকে বলেন। অর্ধেন্দুবাবু তখনই এই প্রতিশোধ নেওয়ার প্ল্যান করেন। নিজের নাম বদল করে রেজিস্ট্রেশন করান সুমন্ত্রবাবুর কাছে। প্ল্যান করেন যে মাঝপথে হঠাৎ করে ফিরে আসার কথা বলবেন। কিন্তু ফিরে না এসে ছদ্মবেশে অন্যনামে এসে ওই হোটেলেই থাকবেন এবং হিরণ্ময়বাবুকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবেন। তারপর বাইরের লোক হিসাবে উনি চুপচাপ কেটে পরবেন। কেউ সন্দেহ-ও করবেনা। এমনকি শুভ্রাংশু সোমের কোন

অস্তিত্বই থাকবেনা আর। আবার তিনি অর্ধেন্দু বাগচী হয়ে ফিরে যাবেন। সোমকবাবুকে হয়তো তিনি সবটা বলেননি, বা বন্ধুর জন্য তিনি সব চেপে রেখেছিলেন। সেটা পুলিশ জানার চেষ্টা করবে। অর্ধেন্দুবাবুর প্ল্যানে কোন আসুবিধে ছিলনা, যদিনা আমি এসে আপনাদের সাথে ভীড়ে যেতাম। আমার ফোটোগ্রাফির হবি থাকায় সেদিন শুভ্রাংশুবাবুর কয়েকটি ছবি গ্রুপ ফোটোর মধ্যে থেকে যায়। উনি মনে মনে ভাবেন যে ছবি থেকে গেলে সেটা ধরে তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য একটা ইম্পর্ট্যান্ট ক্লু থেকে যাবে। তাই পাইন বনের মধ্যে আমায় অতর্কিতে পাথর ছুঁড়ে আহত করে ক্যামেরার থেকে মেমরি কার্ড টা সরিয়ে ফেলেন উনি। ওই একই দিনে হিরণ্ময়বাবু যখন পড়ে যান, আমার বিশ্বাস ওনার পকেট থেকে ঘরের চাবিটিও উনিই সরান এবং তার সাহায্যেই রাতের বেলা রুম খুলে খুন করেন। এখন প্রশ্ন হল, আমার সন্দেহ কিভাবে হল যে দিবাকরবাবু এবং শুভ্রাংশুবাবু আসলে একই লোক? অতীতে হয়তো নাটকে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা থাকায় ছদ্মবেশ অসাধারণ নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা সবাই বোকা হয়ে যেতাম যদি না দুটো ছোট্ট ভুল থাকত। শুভ্রাংশুবাবুর নাকের দুপাশে দুটো দাগ দেখে আমার মনে হয়েছিল যে উনি চশমা পরেন। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবার দরকার পড়েনি। তাই সেটা মনে রাখিনি। পরে দুজনকে মেলানোর কাজে সেটা যদিও হেল্প করেছে। দ্বিতীয়ত, উনি দিবাকর রূপে টুপি পরে বা মাফলার জড়িয়ে মাথার হাল্কা টাক বা গলার কাছের আঁচিল সব ঢেকে ফেলেছিলেন। কিন্তু এগুলো তাঁর আগের প্ল্যানমাফিক ছিল। যেটা প্ল্যানে ছিল না, সেটা হল সেদিন পাইন ফুল পাড়তে গিয়ে কবজির কাছটা ছড়ে যাওয়া। তাই সেটা ঢাকার কথা তাঁর মনে ছিলনা। আমার সাথে কথা বলার পর উনি যখন করমর্দন করেন, সেই দাগটা আমার চোখে পড়ে এবং আমার সন্দেহ শুরু হয়। তারপর, মুম্বই থেকে আসা ওইদিনের সব ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্টে কোথাও দিবাকর দে'র নাম না পেয়ে আমি শিওর হয়ে যাই। এবং, সুমন্ত্রবাবুর এজেন্টের সাথে কথা বলে শুভ্রাংশুবাবুর ফ্লাইটের ইনফর্মেশন পাই। সেখানেও খোঁজ নিয়ে জানি যে ওই নামের টিকিট ছিল, কিন্তু কোন প্যাসেঞ্জার বোর্ডিং করেননি। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল, দিবাকরবাবু যেদিন এলেন, তারপর দিন সকালে শুভ্রাংশুবাবু হোটেল ছাড়লেন। এটা কি করে সম্ভব। তাই না সুমন্ত্রবাবু?"

সুমন্ত্রবাবু বোকার মত মাথা নেড়ে "হ্যাঁ" বললেন।

দীপ্তদা একটু হেসে বলল, "খুব সহজ। আপনি সেদিন খাওয়ার টেবিলে বা লাউঞ্জে কখনো দুজনকে একসাথে দেখেছেন? না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন। দিবাকর যে সম্পুর্ণ বাইরের লোক এবং স্বতন্ত্র, সেটা দেখানোর জন্য অর্ধেন্দুবাবু একটা সাঙ্ঘাতিক মাস্টার প্ল্যান বানান। আর পরেরদিন রাতে যখন সবাই জানে যে শুভ্রাংশুবাবু কোলকাতায়, তখন সেই চুরি করা চাবি দিয়ে হিরণ্ময়বাবুর ঘর খুলে এই অপকর্মটি করলেন উনি। মার্ডার ওয়েপন পাওয়া গেছে। তার গায়ের ফিঙ্গার প্রিন্ট চেক করলেই প্রমাণ হয়ে যাবে সব। আর আজ সকালে আমি যখন বলে যাই যে কেউ যেন উটি ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে, তাহলে পুলিশে ধরবে, তখন অর্ধেন্দুবাবু সেটাকে সুযোগ হিসাবে নেন। হোটেলে পাইকারা যাবেন বলে গাড়ি বুক করিয়ে গাড়িকে কিছু বেশি পয়সা দিয়ে বলেন মেট্টুপালায়াম অবধি ছেড়ে দিয়ে আসতে। উনি গাড়িতে উঠে মেক-আপ ছেড়ে শুভ্রাংশু সোম-এ ফিরে যান। কারণ পুলিশের কাছে দিবাকর দে'র ছবি আছে, শুভ্রাংশু সোমের নেই। আপনার কিছু বলার আছে, অর্ধেন্দুবাবু?"

অর্ধেন্দুবাবুকে দেখে মনে হচ্ছে পুরো ভেঙ্গে পড়েছেন। আসতে আসতে বললেন, "আমি যা করেছি, তার জন্য আমি শাস্তি পাব, আমি জানি। কিন্তু আমি অনুতপ্ত নই। সেদিন মাঠে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে আমি আমার আইডল, আমার বাবাকে মারা যেতে দেখেছি। আর তারপর ওই লোকটাকে হাসতে হাসতে বলতে শুনেছি, কেমন দিলাম, একেবারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিলেক্টেড। তারপর আমি ঠিক করি যে এর প্রতিশোধ আমি নেবই। কারণ, ও ইচ্ছে করে আমার বাবাকে খুন করেছিল।" একটু থেমে বলেন, "কিন্তু আমি ওই ব্র্যাডম্যানের বেল চুরি করিনি।"

দীপ্তদা বলে, “অবশ্যই নয়, অর্ধেন্দুবাবু। আপনার প্রতিশোধ স্পৃহা থাকতে পারে, কিন্তু আপনি চোর নন। সে রাত্রে চুরি করেন অন্য একজন। যিনি মিথ্যেবাদী এবং চোর। নিজে সংবাদপত্রের অফিসের ক্লার্ক হয়ে নিজেকে সাংবাদিক হিসাবে দাবী করেন, আলাপনবাবু।” সবাই আলাপনবাবুর দিকে তাকায়। উনি কি একটা বলতে গিয়েও চুপ করে যান। দীপ্তদা বলে, “রাত্রে ডায়াবেটিসের জন্য বারবার ওঠা ওনার অভ্যাস। উনি সেদিন রাতেও ওই সময় ওঠেন এবং শব্দ পেয়ে আই-পিসে চোখ লাগিয়ে ঠিক উল্টোদিকের রুমে ঘটনাটা দেখেন। এবং এও দেখেন যে অর্ধেন্দুবাবু বেরিয়ে আসেন, কিন্তু দরজা লক করেন না। কৌতুহল নিয়ে আলাপনবাবু হিরণ্ময়বাবুর ঘরে ঢোকেন এবং তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখেন। কিন্তু উনি এত বড় শয়তান যে এই সময়ও নিজে দু-পয়সা পাওয়ার মতলবে হিরণ্ময়বাবুর হ্যান্ডব্যাগ থেকে ‘বেল’টা বের করে নেন। আমি এটা সেদিনই জেরার সময় ধরে ফেলি যখন ব্যাগটা দেখার সময় এক কুচো কাটা নখ পাই। এবং ঠিক তারপরেই প্রশ্ন করার পর সবার সাথে হ্যান্ডশেক করে সবার নখ পরীক্ষা করি। হিরণ্ময়বাবুরও নখ পরীক্ষা করেছিলাম, তাঁর বডি দেখার সময়। দেখি একমাত্র আলাপনবাবুর নখ সদ্য কাটা, এবং সেটা আগেরদিন রাত্রেই। মিঃ স্বামীনাথনকে রিকোয়েস্ট করব আলাপন বাবুর জিনিসপত্র দেখতে। ‘বেল’টা নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।”

দীপ্তদার মিটিং-এর পর স্বামীনাথন ‘বেল’টা উদ্ধার করে দুজনকে নিয়ে থানায় চলে গেলেন। আমার দারুণ এক্সাইটেড লাগছিল। দীপ্তদা সত্যি জিনিয়াস। শুধু সুমন্ত্রবাবুর মন খারাপ। “ধুর্‌ মশাই এতদিন ধরে ঘুরছি। কত লোককে নিয়ে এলাম। এমন ঘটনা কোথাও ঘটেনি।” দীপ্তদা বলল, “একে বলে সঙ্গদোষ। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর গোয়েন্দাসঙ্গে হাজতবাস। যেটা অর্ধেন্দুবাবু আর আলাপনবাবুর হল আর কি!” সুমন্ত্রবাবু বেশ একটা ‘হেঁ হেঁ তা যা বলেছেন’ মার্কা হাসি দিয়ে বললেন, “বেশ একটা গোয়েন্দাসঙ্গ হল। কলকাতায় ফিরে ছাড়ছিনা আপনাকে। যোগাযোগ রাখবেন কিন্তু।” “নিশ্চয়ই” বলে দীপ্তদা আমার দিকে ফিরে বলল, “পটলা, রেডি হয়ে নে। বিকেলের বাসে বেরোবো। কাল ট্রেন তো!” তাই তো! ভুলেই গেছিলাম। ‘পটলা’ বলল বলে একটুও রাগ হলনা। বরং স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের কাছে কিভাবে বলব পুরোটা সেটা ভাবতে ভাবতে রেডি হয়ে নেওয়ার জন্য ঘরের দিকে দৌড়াই।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

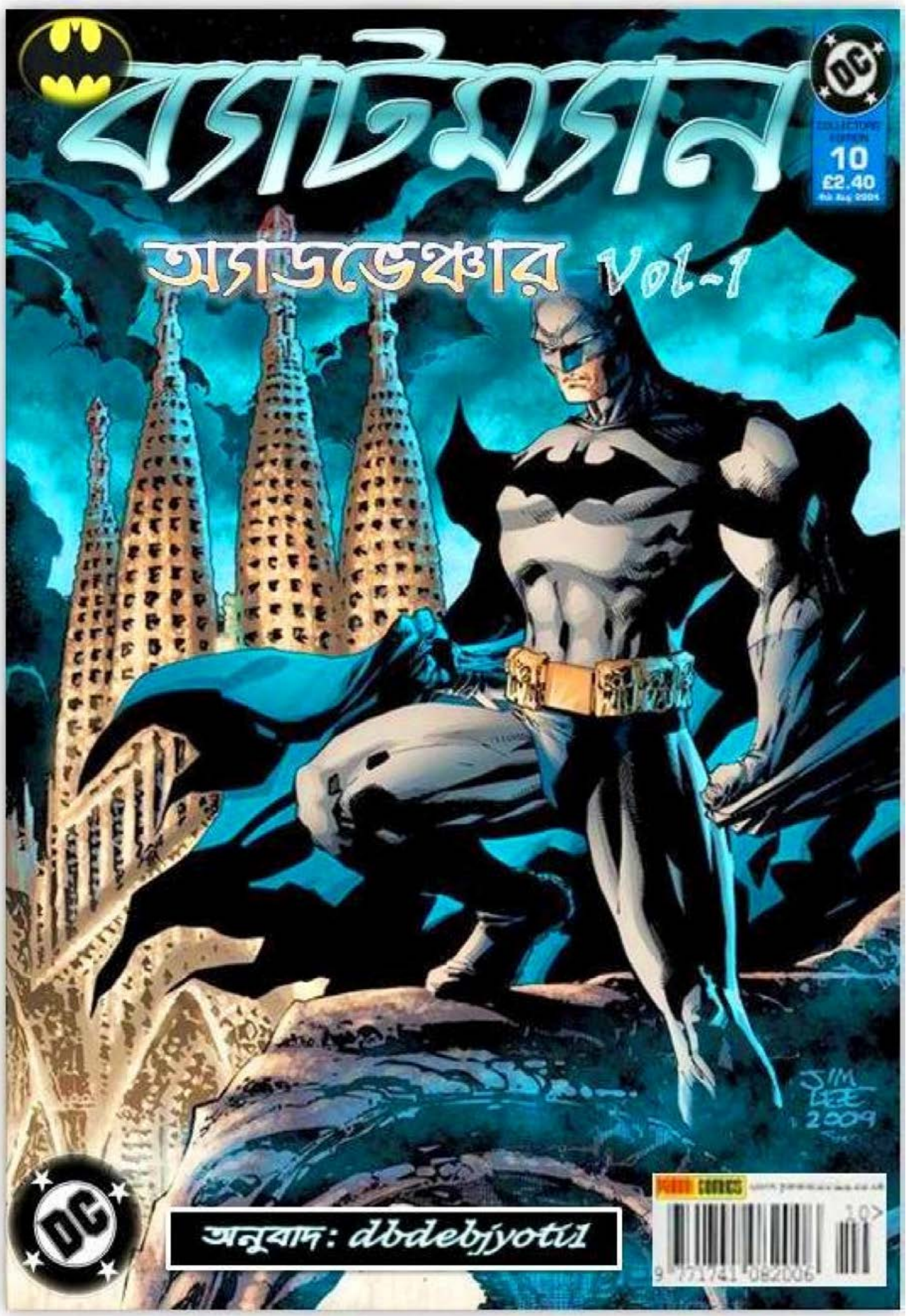
ব্যাটম্যান
10
£2.40
অ্যাডভেঞ্চার Vol-1
JIM LEE 2009
অনুবাদ: dbdebjyoti1

না ! আর সহ্য হচ্ছে না !
এই অপমান অসহ্য লাগছে !
কিন্তু আর নয় !
এবার এর বিচার হবে !
ওকে উচিত শিক্ষা দেব !
গথাম শহর আমার !
শুধু আমার !
মুল কাহিনী :
BOB KANE & BILL FINGER
অনুবাদ : dbdebjyoti1
সংকেতটা বুঝলেন তো কমিশনার গর্ডন ?
"সম্প্রতি ওসওয়াল্ড কোবলিপট, ওরফে পেঙ্গুইন, গথাম শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন !"

ছাতার মত ঐ সংকেতটার মানে কি ?
কোবলিপাট ! মেয়র হয়ে ওর শান্তি হয়নি, এখন সুপারহিরো হতে চায় !
ওসওয়াল্ড কোবলিপটকে মেয়র নির্বাচিত করুন ! পরিবর্তনের সাক্ষী হোন !
কম্পিউটার !
কমিশনার গর্ডনের অফিসের নম্বার ডায়াল করুন !
হ্যালো ?
মনে হচ্ছে নুতন মেয়র সাহেব আমার ব্যপারে তাঁর প্রতিজ্ঞা সত্যি করতে চাইছেন...
আমার পিছনে পুলিশের টিকটিকি লেগেছে !
ইউনিট ৫৬০৭ এর সেই অফিসার স্পারলিং, তাই না ?
ও, ড্রাইভার হিসাবে অবশ্য ভাল না...
দেখুন, আমি চাইনা অফিসারটি আহত হোন !
আমি...
আমি দুঃখিত, এ ব্যপারে আমার কিছু করবার নেই ব্যাটম্যান ! আমাদের নুতন মেয়র সাহেব শপথ গ্রহনের দিনই তোমাকে আইনভঙ্গকারী হিসাবে ঘোষনা করেছে !
2

হুমমমমমম !
তাহলে আলোর সংকেত পাঠালেন কেন ?
ব্যাপারটা, আর্কহ্যাম অ্যাসাইলাম সংক্রান্ত !
আর্কহ্যামে সবগুলি **অ্যালার্ম বেজে উঠেছে** ! টেলিফোন, ক্যামেরা সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন !
ওখানে যাই ঘটুক, তুমি কিছু একটা কর ব্যাটম্যান !....
আমি এখন আর্কহ্যামের দিকেই যাচ্ছি !
সেকি ?.. তোমাকে খবর কে দিল ? আমিও তো একটু আগেই.....
ওখানে আমার নিজস্ব অ্যালার্ম ফিট করা আছে !
এছাড়া ওখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপরেও আমার...
...নিয়ন্ত্রন আছে !
এটা তোমার করা উচিত হয়নি ব্যাটম্যান, আর্কহ্যাম রাষ্ট্রীয় সুরক্ষায়
গুরুত্বপূর্ণ ! ওদের ব্যপারে নাক গলালে,এবার FBI তোমার পিছনে লাগবে !
ওরা আমার মত চুনোপুঁটির পেছনে সময় নষ্ট করবে না
আর্কহ্যামে তোমার লোক পাঠাবার আগে আমায় দশ মিনিট দাও !
কিন্তু...
দশ মিনিটেই কাজ হয়ে যাবে !
উ ৎ ক্ষে প

উউউউউইইইইইইইইইইইইইইইইইইইইইই !
ওটা শুধু লালবাতির সাইরেন ! এখন যে যার ঘরে ঢুকে পড়ো !
শুনলে তো ! যাও সবাই, **যাও** !
ওহ ! ওই জন্তুটা খেপে গেছে ! প্রানে বাঁচতে চইলে **পালাও** !
ছিঃ জোকার ! আজকাল একটুতেই এত ভয় পেয়ে যাচ্ছ !
উউউউউইইইইই
লালবাতি ? ওরে বাবা !..
আমার ডার্লিংকে আর একটা কথা যদি বলেছ, **তবে আমি তোমায়..!!**
ওকে ইলেকট্রো-হিপনো-ড্রাগ-শক থেরাপি দেওয়ার পর থেকেই বেচারার এই অবস্থা হয়েছে !
ওর মাথা এমন গুলিয়ে গেছে, যে ও এখন একটা মাছিও মারতে পারে না !
মাছি ! আহা কি সুন্দর জীব !!
এই লোকটা যদি এখনই চুপ না করে, তবে ওকে আমি ধাক্কা মেরে সিঁড়ির নিচে **ফেলে দেব** !!
ওহ ! সে তো খুব ভালো কথা ! আমিও তোমায় সাহায্য করতে রাজি আছি !
আরে, না না ! ও শুধু ইয়ার্কি মারছিল ! আমরা সত্যি করে কিছু করব না !
কি হে ? এতেই ভয় পয়ে পিছিয়ে গেলে ?!
তবে এস, তারপর দেখ তোমার কি করি !
যথেষ্ট হয়েছে ! এবার যে যার ঘরে চলো সবাই !
ধড়াম !
একি ? দরজা কে বন্ধ করল ?!
4

টিকটিকির হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, তবে এলাকাটা পুলিশে ঘিরে ফেলেছে !
এখন আমার গাড়িটার ব্যবস্থা করতে হবে !
নিরাপত্তা আবরক দিয়ে ঢেকে দেব, স্যার ?
হ্যাঁ, তাই কর !
বোঁওওওওও
বোঁওওওওও
ব্রেক !
ক্যাচ !
বোঁওওওওও
আর্কহ্যমে, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, ওখানকার নিরাপত্তারক্ষীদের বন্দী করা হয়েছে !
তবে একটাই সুখবর !
তারা সকলেই জীবিত !
সত্যি সুখবর !
তাহলে আজ সন্ধ্যায় আপনার ডেটের জন্য জুলি ম্যাডিসনকে আনতে গাড়ি পাঠাই ?!
একদম নয় !
তাহলে সোজা বাড়ি ফিরে আসুন স্যার !

আমাদের এখান থেকে বেরোতে দাও !
বহুদিন তোমরা আমাদের এভাবে ভয় পাওনি ! হা হা !
আহ্ ! এই তো চাই !
ঐ দ্যাখো, তোমাদের জন্য আমার রক্ষীরা এসে পড়েছে ! ভাল চাও তো পিছু হটো !
দড়াম !
আহ্, দেখে তো মনে হচ্ছে এরা আমাদেরই লোক, ওদের নয় !
এই আক্রমনের পরিকল্পনাটা কার ?
কাকতাড়ুয়া, তোমার নাকি
উঁহু ! আমার তো নয়..
আমিও তো এদের কাউকেই চিনি না...
...তবে এক মিনিটেই চিনে নিতে পারি !
বিষকন্যা আইভি !
তোকেই আগে শেষ করব !
আ ই ভি !

এই, তোমরা ও জন আমার সাথে এসো !
ক-কি বললে ?
না !
কোন চিন্তা নেই বন্ধু ! তোমরা ওপাশের ঠান্ডা ঘরে নিরাপদেই থাকবে !
আইত্তি !
গদাম !
বস্‌স, ও আর সমস্যা করবে না !
এবার তোমার পালা দ্বিমুখী শয়তান !
খুব শিগগিরি তোমারও এই হাল হবে !
থামো !
আমি বাঁচব না মরব, তোমরা বলবে না !
সেটা বলবে এই মুদ্রাটা !
হুম !
দেখা যাক ভাগ্য কি বলে ?!
বেশ, এবার তোমরা এগোতে পারো !

আমাকে এখান থেকে বেরোতে দাও !
গদাম !
ধড়াম !
সবাই যে যার ঘরে ঢুকে পড়ো ! জলদি !
ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি !
8

খটাস !
আমাকে বেরোতে দাও !
বের কর আমাকে !
গদাম !
সবাই ঠিক আছে তো ?
আমার কিছু বলার আছে !

এদের চিনেছি ! এই দুষ্কৃতীরা ছায়াময় গম্ভীর সদস্য !..
এদের নেতা হল র‍্যাস এল গুল !
এখন প্রশ্ন হল, ওরা কি চায় ? আর তোমাদের মধ্যে কে ওদের শত্রু আছে ?!
তোমার কি ধারনা, আমার কাছে এইসব প্রশ্নের উত্তর আছে ?
উফফফ.. হার্ভির কথা জানি না, তবে...
....আমি কখনো এই র‍্যাস এল গুল এর নাম শুনিনি আর তার সাথে শত্রুতার কথাও কিছু জানি না !
আইভি !
তুমি বেঁচে আছ !
ছেলেখেলা নয় !
গায়ে আঁচড়টা পর্যন্ত লাগেনি !
কিন্তু আমি যে দেখলাম ছুরিটা তোমার বুকে বিঁধিয়ে দিতে !
হার্লে, এখন মান-অভিমানের সময় নয় !
তারমানে এরমধ্যে কোন রহস্য আছে যেটা আমাকেও বলোনি ! কিন্তু কেন ?
কাকতাড়ুয়া !..
এবার তোর পালা....

আমি মুক্তি চাই ! আমি...
গদাম !
...মুক্তি চাই !
আ-আমি..
হিসসসস!
আমি...
...এখন....
...মুক্ত !
11

গুড়ুম!
হার্লে....
...তুমি ঠিক আছ তো... ?
12

তোমার কি আসে যায় ?
ওহ ঐ বোমা...
বিষফোরণ, বিষফোরণ.....এটাকে এড়ানো গেল না !
ভালো বন্ধুরা নিজেদের সবকথা পরস্পরকে জানায়...
যেমন কোন টাটু বা চাকরির ব্যাপারে....
গেল কোথায় জিনিসটা ?!
..আর তুমি যে পুরোপুরি মানবী অবস্থায় নেই, সেটাও আমাকে বলোনি !
এই ব্যপারটা তোমার না জানাই ভালো ছিল !
এখন আমাকে ধরে তুলবে.....
...দয়া করে ?
নিজেই উঠে দাঁড়াও স্বার্থপর ! তোমার আমাকে সব বলা উচিত ছিল !
চলে এসো মিঃ জোকার !
এক মিনিটের মধ্যে আসছি !
এহেএএএএ ! একি দেখছি আমি !
না না ! তোমাকে উঠতে হবে না ব্যাটম্যান..
পেয়েছি !
13
ভারী লোহার দরজার তলায় চাপা পড়ে তোমায় দারুন দেখাচ্ছে !
জোকার..

তুমি তোমার ঐ বিশ্রী মুখটা বন্ধ রাখ !...
ব্যাটম্যান তো আমাদের বাঁচাতেই চাইছে !
উঠে পড়ো ব্যাটম্যান !
আমি দেখলাম আমার মুদ্রাটা এই দেয়ালটার তলায় চাপা পড়েছে !
তুমি না উঠলে ওটা নড়াতেও পারছি না !..
বেশ ! এবার তুমি ঐ মুখোশধারী দুষ্কৃতীগুলোর পিছনে ধাওয়া করতে পার !
আমি নজর রাখছি এখান থেকে যেন কেউ পালাতে না পারে !..
ধন্যবাদ হার্ভি !
আমাকে ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই, তুমি নিশ্চিন্তে যাও !
হার্ভি, এবার আমরা বাইরে যেতে পারি তো ?
উঁহুঁ !
একদম নয় !
টিসুম !
টিসুম !
14

আপনারা ঠিক আছেন তো ?
হ্যঁ, তবে দুজন দুষ্কৃতী এইমাত্র ওদিকে..
...ছুটে পালাল !
ঐ দেখ, ওদিকে ব্যাটম্যান এসে পড়েছে !
এক্ষুনি পালাতে হবে !

ইসসসসসস !
আলফ্রেড !
বলুন স্যার .
রিং বেকার সেন্ডেন স্ট্রীট থেকে আমাকে তুলে নেবার ব্যবস্থা কর !
নিশ্চয়ই স্যার ! আপনার আজকের সন্ধ্যাটা ভালো কাটলো তো ?
সবই ভালো, শুধু....
পুলিশের সাথে অভিজ্ঞতাটা ভালো নয়...
ওদের থেকে দূরে থাকতে হবে !
অন্তত এই মুহূর্তে !

ঐ দেখ, দেওয়ালে একটা বড় গর্ত !
স্পটলাইটটা ওখানে ফেলুন !
দমকল আনার ব্যবস্থা কর ! আর চারিদিক ঘিরে ফেল !
সতর্ক থেকো, ওরা সসস্ত্র হতে পারে !
ঐযে ব্যাটম্যান ওখানে !
সাবধান, ও কিছু ছুঁড়ে মারল !
ঝন ঝনাত !
উফ ! কি দারুন টিপ, প্রায় একশো গজ দুর থেকে !
ও এটা করল যাতে অন্ধকারে ও ধরা না পড়ে !
আলো থাকলেও ওকে ধরতে পারতাম না !
শুধু আলো নেভানোর জন্য সে জিনিসটা ছোঁড়েনি !
...ওটা আমার জন্য একটা সংকেত !
এরপর নতুন গল্প !

এবার আমার কাহিনি বলি ! যার শুরু...
..জরোর গল্প দিয়ে !
শার্লক হোমস অথবা মামদো ভূতের চেয়েও আমার প্রিয় ছিল জরোর গল্প !
সে সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মেও নিরপরাধ, দরিদ্র মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করত !
একজন মুখোশধারী রহস্যময় যোদ্ধা ! এক নির্ভীক নায়ক !
জরো
THE MARK OF ZORRO
আমাদের সকলের এই ছবিটি বেশ ভাল লেগেছিল, কিন্তু তারপরেই হঠাৎ.....
জরোর গল্প
LINDA DARNELL
গুড়ুম !
র
গ
ল্প
..সেই রাতটা জীবনের সবচেয়ে কলঙ্কময় রাত্রিতে পরিনত হল !

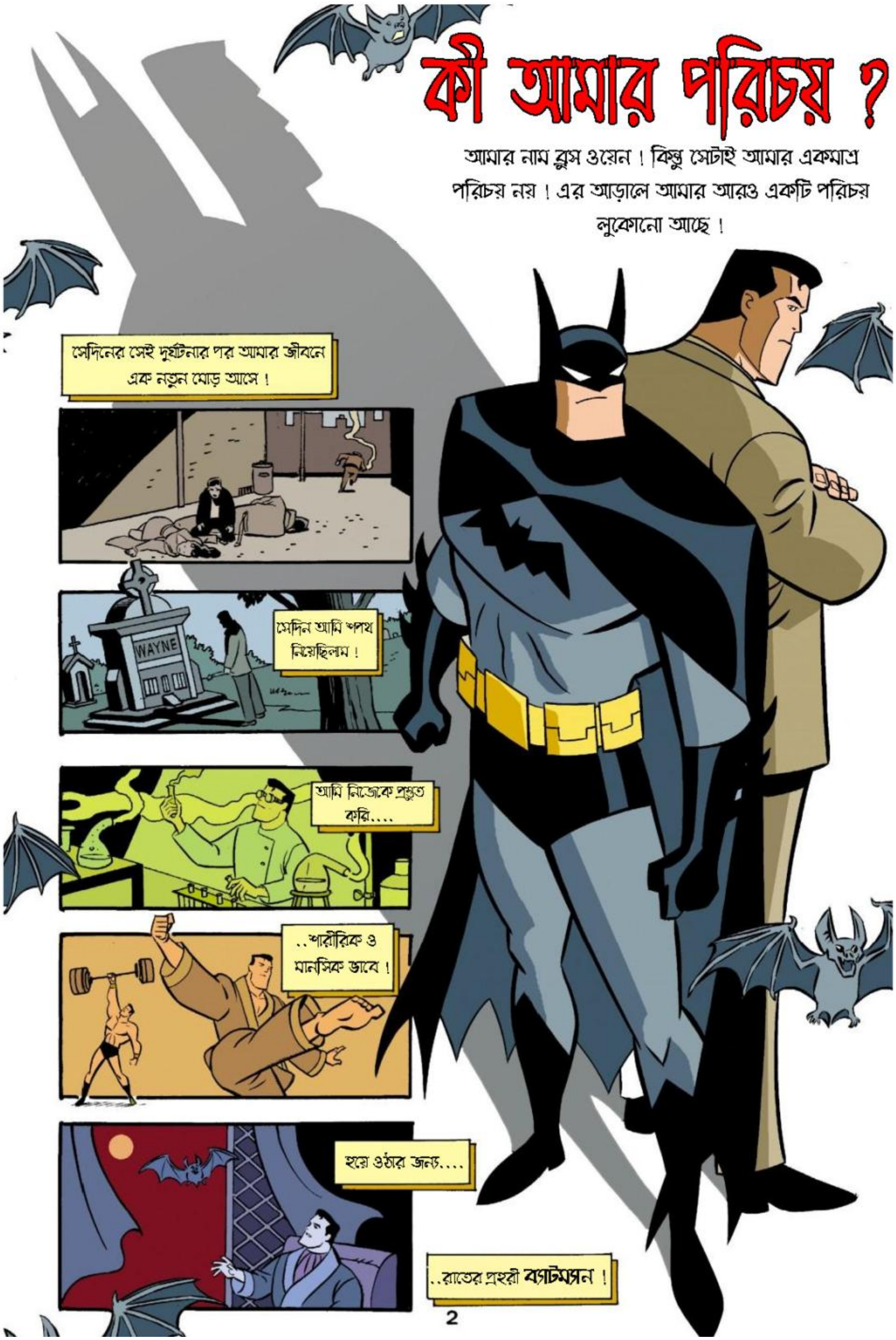
কী আমার পরিচয় ?
আমার নাম ব্রুস ওয়েন ! কিন্তু সেটাই আমার একমাত্র পরিচয় নয় ! এর আড়ালে আমার আরও একটি পরিচয় লুকোনো আছে !
সেদিনের সেই দুর্ঘটনার পর আমার জীবনে এক নতুন মোড় আসে !
WAYNE
সেদিন আমি শপথ নিয়েছিলাম !
আমি নিজেকে প্রস্তুত করি....
..শারীরিক ও মানসিক ভাবে !
হয়ে ওঠার জন্য....
..রাতের প্রহরী ব্যাটম্যান !
2

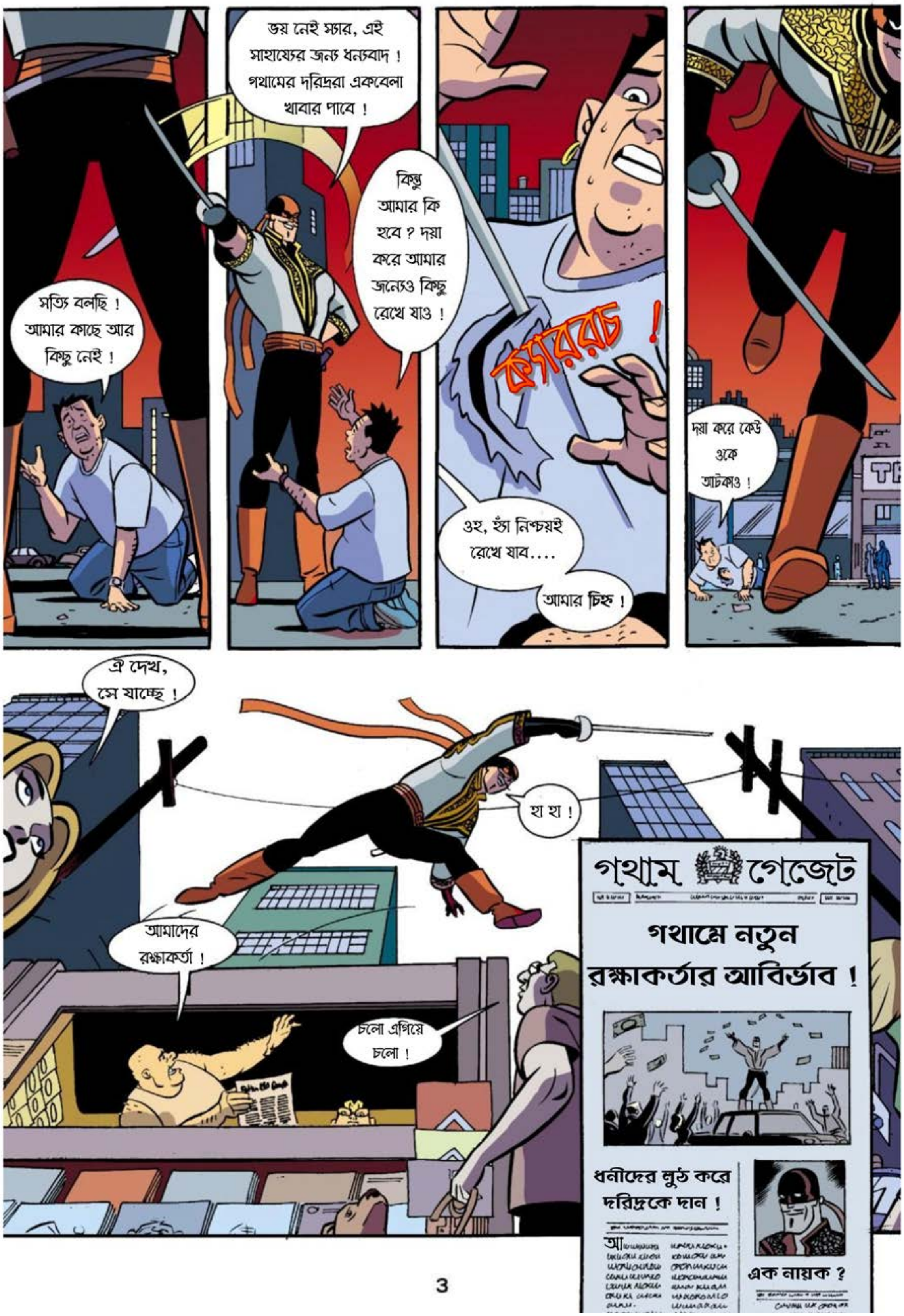
সত্যি বলছি ! আমার কাছে আর কিছু নেই !
ভয় নেই স্যার, এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ ! গথামের দরিদ্ররা একবেলা খাবার পাবে !
কিন্তু আমার কি হবে ? দয়া করে আমার জন্যেও কিছু রেখে যাও !
ক্যাড়ড়চ !
ওহ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই রেখে যাব....
আমার চিহ্ন !
দয়া করে কেউ ওকে আটকাও !
ঐ দেখ, সে যাচ্ছে !
হা হা !
আমাদের রক্ষাকর্তা !
চলো এগিয়ে চলো !
গথাম গেজেট
গথামে নতুন রক্ষাকর্তার আবির্ভাব !
ধনীদের লুঠ করে দরিদ্রকে দান !
এক নায়ক ?
3

এই যে, রক্ষাকর্তা এইদিকে জলদি !
এটাই লুকোবার একমাত্র জায়গা !
পোঁওওওওও !
হিহি ! আজ আবার রক্ষাকর্তা পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গেল…
…কতগুলো বোকা লোকের সাহায্যে !
তোমার ধারনা ভুল রক্ষাকর্তা !
..কিন্তু বেশিরভাগটাই নিজের পকেটে ঢোকানোর পর !
ব্যাটম্যান !
তোমার এই পরিকল্পনা শহরবাসীর কাছে তোমাকে নায়ক বানাতে পারে !….
ধনীদের লুঠ করে দরিদ্রকে দান…
টিসুম !
কিন্তু আমার কাছে…
তুমি একটা ছিচকে চোরের বেশি কিছু নও !
4

আর একটা কথা...
তুমি কখনো জরো হবার চেষ্টা কোরো না !
গদাম !
পুলিশ
এই শহরে কখোনো নয় !
ওর জন্য আরেকজন আছে !
সমাপ্ত